চীনের যৌবন অভিযান

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আত্মশক্তি লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সন ১৩১৮ সাল।

প্রকাশক—

শ্রীবরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দাম একটাকা

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার
ক্লাসিক প্রেস,
১১৭.১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

একজন দার্শনিক বলেছেন, মানুষ দেবতাও বটে, পশুও বটে। সে কোনটাই একক ভাবে নয়, সে হচ্চে দেবত্ব ও পশুত্বের সমন্বয়। কথাটা সত্য। এই দেবত্বের অংশটুকুই প্রধান হয়, যখন মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে বিশ্বমানবের উন্নতিকল্পনায়। আবার পশুত্বের আধিপত্যকালে মানুষ স্বীয় স্বার্থের গণ্ডীর ভিতর অসম্ভব-রকম সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে।

বিংশ-শতাব্দীর মানুষ, দেবত্বের পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছে বলা দুরূহ। শতসহস্র বৎসরের অতীতের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেও দেবত্বের সঞ্চয় তেমন করতে পারেনি; সভ্যতার সাতসমুদ্র তেরনদী অতিক্রম করেও মানুষ আজও জলমগ্ন হবার আশঙ্কা পোষণ করে। শক্তিমান পাশ্চাত্যজাতীরা প্রাচ্যের সবাইকে হেয়-জ্ঞান করে। কারণ প্রাচ্যের পার্থিবসম্পদ নাকি পরিমিত—তাদের তুলনায় নেহাৎ নগন্য! এমনকি প্রাচ্যজাতীদের গায়ের চামড়াও নাকি নিকৃষ্ট! দেখা যায় ভাগ্যদেবীর-বরপুত্র এই পাশ্চাত্যজাতীরা প্রাচ্যে (যেমন—চীনে) নিরাপদ ভাবে অধিষ্ঠিত হ'তে না-হতেই আধিপত্য বিস্তার করেছে। নিজেদের ভিতর তাদের সুবন্দোবস্ত আছে—কেউ কারুকে বাধা দেয়না; উপরন্তু এই মর্ম্মে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ যে ভবিষ্যতে যদি চীনকে

শোষণকরার সুযোগ হয়ত' সবাই সমান অংশ পাবে। লুণ্ঠিত-সম্পদ বণ্টনে তারতম্য হবে না।

পাশ্চাত্য-শক্তির বজ্রমুষ্টি চীনের গলাচেপে ধরেছে তাকে হত্যা করবে বলে; সে মুষ্টি ছিন্ন করতে চীন বদ্ধপরিকর। **H. M. Hyndman** বলেছেন,—"পাশ্চাত্য ব্যবসাবাণিজ্য, ধর্ম্মপ্রচার, আর ওই আধিপত্য-বিস্তার প্রাচ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। আমরা ওদের যেটুকু উন্নতি করেছি বলে' গর্ব্ব করে' থাকি সেটুকু তাদের প্রতি আমাদের অনিষ্টের সঙ্গে তুলনা করলে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।"

ইনি আরএক স্থলে বলেছেন,—"ইউরোপের কাছে এসিয়া খুব অল্পই ঋণী,—হয়ত' ঋণীই নয়। ইউরোপ যদি তা'কে খুব বেশী কিছু শিখিয়ে থাকেত—উন্নত-উপায়ে খুন্ করতে শিখিয়েছে, মুষ্টিমেয় জনকতকের হাতে ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত করবার প্রকৃষ্ট উপায়ের সন্ধান দিয়েছে, রক্তপাতের পর রক্তপাত করে ইউরোপ ব্যবসার সুব্যবস্থা করেছে!"

ইউরোপের হাতে চীন সমান-ব্যবহার পায়নি; আর এই সমানাধিকার অস্বীকার করার ফলে চীন আজ বিদ্রোহী। "চীনের যৌবন অভিযান" এই বিদ্রোহীদেরই ইতিহাস। এই পুস্তকটীকে নব্য-চীনা-তরুণের জীবনী বলা যেতে পারে। এই জাতির জীবনে যতকিছু সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, এই পুস্তকে সে সবের আলোচনা করা হয়েছে। বিজাতী-শোষিত-ভারতের যুবজনের জ্ঞাতব্য

অনেককিছুই এর মধ্যে পাওয়া যাবে। আমাদেরও রাষ্ট্রে, সমাজে, সংসারে, ধর্ম্মে ও শিক্ষায় বিপ্লব ছাড়া উপায়ান্তর নেই। যাঁরা আমাদের দেশে বিপ্লবী হয়েছেন, বা হ'বেন তাঁদের আধ্যাত্মিক সাহায্য কল্পনায় এই পুস্তক রচিত। চীনের যুবজনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ-সৃষ্টির সম্ভবনা একমাত্র সাহিত্যের সাহায্যে। তদনুরূপ সাহিত্য-সৃষ্টিই এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য।

বিপ্লব করলেই বাধা পেতে হয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিপ্লবী-চীনা-তরুণ শুধু রক্ষণশীল স্বেচ্ছাচারী স্বজাতীর শত্রুতাই প্রত্যক্ষ্য করেনি; ইংরাজের শত্রুতাও লক্ষ্য করেছে। এই বিপ্লবান্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য তারা চেষ্টার ত্রুটী করেনি। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজ সব অস্ত্রই ব্যবহার করেছে; যার ফলে দুটী জাতির মধ্যে চিরন্তন শত্রুতার আশঙ্কা আছে। ইংরাজ John Nind Smith বলেছেন,

"স্বদেশভক্ত চীনাদের প্রতি শত্রুতা না-করে, তাদের সাহায্য কর্‌তে পার্‌লে চীনের অশান্তিকে এড়ানো যেতো। এখনও আমরা নব্য-চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারি। সর্ব্বোপরি, ন্যায়বান হওয়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।"—

শ্রুতিমধুর কথার-জাল রচনা করে অনেকসময় কিছু লাভ হয় না যদি না পশ্চাতে অনুকূল কর্ম্ম-প্রচেষ্টা থাকে। ইউরোপীয় শক্তিরা বাক্যে আশ্বাস দিয়ে অনেকদিনই বলেছেন যে, চীনাকে তাঁরা মিত্র ভিন্ন অন্য কিছু ভাবেন না—কিন্তু কাজে তাঁরা ঠিক্

বিপরীত পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং পৃথিবীর অশান্তির কিছু লাঘব হয়নি।

ভবিষ্যতে যদি মানবের মধ্যে দেবত্বের প্রাধান্য হয় তবেই হয়ত' পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে; নচেৎ মানুষ যদি শক্তির মোহে পশুত্বকেই প্রাধান্য দেয়; জাতি, ধর্ম্ম এবং চামড়ার প্রভেদের জন্য যদি ব্যবহারের তারতম্য পূর্ব্বের মতই বর্ত্তমান থাকে—তাহলে এমন যুদ্ধও অদূর-ভবিষ্যতে বাধতে পারে যা বর্ব্বরতায়—গত-মহাযুদ্ধকেও অতিক্রম করবে; তাহ'লে আর উৎপীড়ক এবং উৎপীড়িতের অস্ত্রের ঠোকাঠুকি থামবেনা—অসির ঝঞ্ঝণা বাতাসের বুকে চিরন্তন আসন পাতবে।

কিন্তু যে শ্রেণীর মানুষের রক্ত দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তারাই আজ স্থিতধী বিজ্ঞের মত বল্‌ছে, রক্তপাতে আর আবশ্যক নেই; পুনঃ রক্তপাতে বিংশশতাব্দীর এই প্রিয়-সভ্যতার উৎকর্ষ-সাধন না হয়ে—পরিসমাপ্তি ঘট্‌বে;—বিশ্বের যুবজন আজ এই অনর্থ-দ্বন্দের মূল-উৎপাটনে বদ্ধ-পরিকর।

মূলের সন্ধানে তারা এসে দেখেছে—সাম্রাজ্যবাদ, ধন-গর্ব্বিত মুষ্টিমেয় জাতের অপরিমিত আস্ফালন। আর এই সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘজীবনের কারণ হচ্চে ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি জাতির পরাধীনতা; সুতরাং ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি জাতিকে শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীন হ'তে হ'বে; শুধু নিজের জন্য নয় বিশ্বমানবের মঙ্গল কামনায়। চীনা-যুবজনের অভিযান এই আদর্শোদ্ধারের পথে; যাত্রা তাদের জয়-যুক্ত হোক্।

—**গ্রন্থকার**।

চীনের যৌবন অভিযান

"আজি, চীনের ধূপে আসর ওঠে মাতি,
জাগে, প্রাচীর চোখে অরুণ আলোর নেশা।
বুঝি, কাট্‌লো কালো, আঁধার-ঘন-রাতি।
সুরু, পথের বুকে সবার সাথে মেশা॥"

এক

প্রাচ্য-সভ্যতা প্রাচীন,—হাজার হাজার বছর আগেকার,—পশ্চিম জুড়ে তখন ছিল অসভ্য-মানুষ, যাদের ক্রিয়াকলাপ তখনও মানব-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পা'বার উপযুক্ত হয়নি। লক্ষ লক্ষ দিবস রজনীর কর্ম্ম, ক্লান্তি, সৃষ্টি, স্বপ্নের সৌন্দর্য্য-সম্পদে প্রাচী পৃথিবীর বুকে সমুজ্জ্বল ছিল। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের বিরাট অংশ জুড়ে পড়েছিল চীন,—তা'র প্রাচীন-সভ্যতার ধূপের ধোঁয়ায় মশ্‌গুল্ হয়ে। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের

বাণী কণ্ঠে নেবার অবসর তার ছিল না ; কিন্তু যেন তা'র তিন-হাজার বছরের সভ্যতা-সমুদ্রের প্রশান্তিও চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো, অন্তর বিক্ষুব্ধ হ'ল পাশ্চাত্য-সভ্যতার ঝড়ো-হাওয়ায়। চুপিসাড়ে পিছন থেকে এসে পাশ্চাত্য-সভ্যতা তা'র চোখটিপে ধর্‌লে। চীন হঠাৎ অন্ধকার দেখ্‌লে !

সে চিরকাল জেনে এসেছে—দেহ আর আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; দেহকে বিপন্ন করেও আত্মার খোরাক যোগাতে হয়েছে তা'কে—চিরদিন ; কিন্তু আজ জড়বাদীদের জালে ধরা পড়ে—তা'কে আত্মাকে বিস্মৃত হ'তে হবে, দেহ-পরিচর্য্যার উৎসবে ? স্বীয় বস্তু-বিচ্ছিন্ন-ভাবকে অপসারিত ক'রে, চীন আজ নব্য-জগতের উৎকৃষ্ট-বস্তু-তান্ত্রিক হবার চেষ্টায় বাঁধা পড়েছে—Lilliputএর শৃঙ্খলে।

সমস্ত পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ নিয়েও—চীন আজ পাশ্চাত্য-জাতির নাগপাশে আবদ্ধ। এতবড় অবস্থা-বিপর্য্যয়ও সম্ভাবনার সীমা-রেখা অতিক্রম করেনি। সারা Europe জুড়ে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প-জগতে বিপ্লব ঘটে যায়, যা'র ফলে ইউরোপীয় জাতি সমূহ, বিশেষতঃ—ইংলণ্ড শিল্প-জাত-দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিজেদের দৈনন্দিন-জীবনের সুখ, শান্তি, সজ্জা, বিলাসের প্রাচুর্য্যে পরিতৃপ্ত হয়েও জীবনের এবং বিলাসের প্রচুর উপকরণ উদ্বৃত্ত রইলো ; এসবের সদ্ব্যবহার কর্‌বে কারা ? হতভাগ্য প্রাচ্যদেশ সমূহে পড়্‌লো

তাদের নজর ; ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশ ছেয়ে ফেল্‌লে তাদের বিপুল-দ্রব্য-সম্ভারে। ব্যবসাকে পাকা এবং নির্ব্বিঘ্ন কর্‌বার উদ্দেশ্যে এই পাশ্চাত্য-জাতীরা প্রাচ্য-জাতীর নিকট ভিক্ষা চাইলে সামান্য একটু ভূখণ্ড। স্বভাবের সরলতা বশতঃই হোক্, কিম্বা খোস্ মেজাজেই হোক্, প্রাচ্য ভূম্যধিকারীরা তা'দের প্রার্থনা মঞ্জুর কর্‌লেন—আর কৃতজ্ঞতার নিদান স্বরূপ যেটা পেলেন, সেটা ফুলের মালার মত কোমল মনে হলেও আসলে পরাধীনতার শৃঙ্খল। সহৃদয়তা দেখিয়ে চীন-সম্রাট খাল কাট্‌লেন ; খালের গর্ভভরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এ'ল—কুমীরের দল ;—ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান। বিস্মিত-চীনের মৌনতার সুযোগে শোষণ-নীতি পুরোদমে চল্‌লো। আশ্চর্য্যের বিষয়, শুধু Great Britainই সমগ্র চীনের ভূখণ্ডের শতকরা সাতাশ ভাগের অধিপতি ! এই অধিকার তারা সদুপায়ে উপার্জ্জন করেনি ; তিল তিল করে অপহরণ করেছে,—কুৎসিৎ-চক্রান্ত আর পাশব-শক্তির দাপটে ! লক্ষ কোটী নর-নারীর অন্নের ওপর দস্যুতা করে এরা নিজের ঘরে 'মরাই' বেঁধেছে। বহুকালধরে নির্বিঘ্নে শোষণ করে পাশ্চাত্য-জাতিদের সাহসের মাত্রা বেড়েই চলেছে ;—এমনকি তারা আজ চীনকে অন্তঃসার-শূন্য করে দিতেও পরাঙ্মুখ নয় ! নির্ব্বিচারে স্বাধীকার হ'তে বঞ্চিত হওয়ার ফলে চীন আজ আত্ম-সম্মান পুনঃ অর্জ্জন কর্‌বার জন্য উৎসুক—আজ সে অস্ত্র ধারণ করেছে। কিন্তু চীনেরা চিরকালই

শান্তি-প্রিয়। স্বদেশের সৌন্দর্য্য ও সম্পদের গরিমায় চীন চিরকালই আত্মহারা। তাই অস্ত্র হাতে করেও তাকে বল্‌তে হয়েছে—

"পাশ্চাত্য শক্তিমান জাতিরা যদি আজ তাঁদের শোষননীতি ত্যাগ করেন—ত'হলে আজ হ'তেই তাঁরা আমাদের সুহৃদ, সম্মানের বন্ধু;—বিনা দ্বিধায় আমরা তাঁদের সহযোগিতা কর্‌বো। আমরা বিজাতিবিদ্বেষী কী করে হই? কোনও দেশের রাষ্ট্রশক্তি শোষন-ভক্ত হ'তে পারে—কিন্তু তাই বলে কি সে দেশের সব লোকই এই পৈশাচিক-প্রথার সমর্থন করে? তা নয়। আমরা জানি যে পৃথিবীর সব দেশের লোকই চীনের সাহায্য চায় এই হীন অমানুষিকতার ধ্বংস কর্‌তে। একাজ একবার সম্ভব হ'লে শুধু চীন কেন সারা পৃথিবী উপকৃত হ'বে।"

দেশের দেউলে হ'বার উপক্রম দেখে—চীনের তন্দ্রার নেশা একদম্ ছুটে গেল। চীনের চিন্তাশীল স্বদেশ ভক্তরা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হ'ল;—চীনের তরুণ সম্প্রদায় তাদের বিপুল-কর্ম্মশক্তি আর স্বার্থত্যাগ নিয়ে নাম্‌লো—জীবন মরণের সমস্যায় —বিপ্লবের রক্ত-নিশান উড়িয়ে।—এই তরুণের মুক্তি অভিযানই জাগ্রত চীন শক্তির স্বরূপ। পাশ্চাত্য-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তারা এই সত্য উপলব্ধি কর্‌লে যে, অধুনা জগতের মূল-শক্তি প্রয়োগ যেখানে হচ্চে সেস্থান চির-সুন্দর নয়, শাশ্বত নয়। আবার তারা, নিজেরা, প্রাচীন-সভ্যতার আওতায় বসে যা' ভেবেছে

তার মূলেও গলদ আছে যথেষ্ট ;—সুতরাং মুক্তিকে চির-সুন্দর ও শাশ্বত কর্‌বার জন্য তাদের যৌবন-অভিযান চল্‌বে নতুন পথে, নব-আদর্শের সন্ধানে।

চীনের তরুণ আন্দোলনের ইতিহাস৷ পর্য্যালোচনা কর্‌লে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে—সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম সবের বিরুদ্ধেই তাদের অভিযান। জীবনের সব পথেই তারা নিত্য নূতনের সন্ধানে চলেছে,—তারা বুঝেছে যে অতীত গৌরবের ছায়াপথ তাদের ত্যাগ করতে হ'বে ; কারণ বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য-পথে, তাদের সুপ্রাচীন অতীতের—যা' কিছু সবই বৈষম্যের সৃষ্টি কর্‌বে মাত্র। অতীত হচ্চে মানুষের স্মৃতি, বর্ত্তমান মানুষের জীবন আর ভবিষ্যৎ মানুষ্যের আশা, মানুষের চির-ইপ্সিত কল্প-লোক। স্মৃতির কুয়াসায় যদি এই কল্পলোক আব্‌ছায়া, অন্ধকার হয়ে যায় ত'হলে আর জীবনের সৌন্দর্য্য থাকে না। তাই কখনও স্মৃতিকে মুছে ফেল্‌বার আবশ্যক হয় ; অতীতকে অমান্য করা হয়ে ওঠে অনিবার্য্য। এই কারণেই চীনা-তরুণের বিদ্রোহ, সনাতনপন্থী, স্থবীর সংসার সমাজের বিরুদ্ধে, কঙ্কালসার con-fucianism'র বিরুদ্ধে আর নষ্ট-রাষ্ট্র Manchu শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে পুরাতনের মোহ কাটিয়ে উঠে তারা আজ বর্ত্তমানের মায়ায় মুগ্ধ।

চীনের যৌবন অভিযান

দুই

"দ্বারখুলে কেসে
পথেতে এসেছে নামি ?
কারে ভালবেসে
কাটে তার দিবাযামি ?

শত নিপীড়নে
বুক অকাতরে পাতা ?
ভীতা বন্ধনে
সেযে তা'র দেশমাতা ॥"

প্রাচ্যের অপরাপর দেশসমূহের সঙ্গে ব্যবসায়, বাণিজ্যে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকলেও এমনকি আশী বছর আগে পর্য্যন্ত ইউরোপের সঙ্গে চীনের সংস্পর্শ ছিল না—বিরাট বপু নিয়ে চীন ছিল পাশ্চাত্য আবহাওয়ার অন্তরালে। কিন্তু আধুনিক জগতের ধারানুযায়ী এই ব্যবধান চিরস্থায়ী হ'তে পারেনা—তাই তার চিরকালের না-জানার ঔদাসীন্য জানা'র স্পৃহায় চঞ্চল হয়ে উঠ'লো। চীন যখন ইউরোপকে জান্‌লে, বুঝ্‌লে তা'র গোপন কথাটী কী,—তখন তার অন্তরে দুটী বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষ বেঁধে গেছে; প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদ পাশ্চাত্যের জড়বাদের আড়ম্বর দেখে ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাব্‌ছে—এ'র সঙ্গে মিলনের পথ কি চিরকালের জন্য বন্ধ ?—

সভ্যতার এই সংঘর্ষের ফলে চীনের চিন্তার ও ভাবধারার পুর্ণজন্ম হ'ল; আর তখন থেকেই সুরু হ'ল যৌবন-অভিযান। পূব, পশ্চিম—এই দুই জগতের যোগসূত্র হ'ল মানুষ নিজেই। যদি চীন আবহমানকাল তার সন্তানদের ঘরের কোনেই বেঁধে রাখ্‌তো, তাহলে বোধ হয় আজ তরুণ-আন্দোলন বলে চীনে কিছু থাকৃতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু তা' হয়নি;

চীনের যৌবন অভিযান

আজ আশী বছর ধরে চীনা তরুণ দলে দলে চলেছে ইউরোপে তীর্থ যাত্রায়; তাদের সঞ্চিতপূণ্য চীনের যৌবন অভিযানে মূর্ত্ত।

চীনের তরুণ আন্দোলনকে সম্যকরূপে বুঝ্‌তে গেলে, এই তীর্থ যাত্রীদের ইতিহাস অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তীর্থের পথে অগ্রদূত ছিলেন যিনি, তিনি আজ সারাচীনের উপাস্য দেবতা, সারা পৃথিবীর নমস্য। স্বদেশের স্পর্শথেকে নিজেকে বঞ্চিত করে—অচিন্ সাগরে ভাস্‌লেন—Yungwing, ১৮৪৭ সালের প্রভাতে। 'কালাপানির' পারে তাঁর আগে আর কেউ যায়নি; ঘরের ছেলে পরহয়ে যাওয়ার অযথা অপবাদে তাঁর আগে আর কেউ চীনা-সম্রাটের রোষানলে দগ্ধ হয়নি। অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি ১২০ জন চীনা ছাত্রকে আমেরিকায় পাঠাতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। কিন্তু সম্রাটের মাথায় টনক নড়ে উঠ্‌লো;—যদি এই ছাত্রসম্প্রদায় একদম্ 'গোল্লায়' যায়? সম্রাটের অলঙ্ঘ আদেশে তাদের ফির্‌তে হলো,—ফির্‌লেন না শুধু Yungwing;—১৯১২ সালে আমেরিকাতেই—নির্ব্বাসিত অবস্থায় তিনি দেহমুক্ত হলেন। নির্ব্বাসিত নরশ্রেষ্ঠের আত্মা চির-নির্ব্বাণ লাভ কর্‌লে।

আকাঙ্ক্ষা হ'চ্চে মনের আগুন—তা'কে নিভিয়ে রাখা যায়না;—পরিতৃপ্তি তার হবেই। তীর্থের পথে Yungwing'র পায়ের রেখা বিলুপ্ত হয়নি। নবীন যাত্রীদেরও দৃষ্টি ছিল

অভ্রান্ত, তাই হাজার হাজার চীনা-তরুণ—তাদের অগ্রদূতের পায়ে-চলা পথে নির্ভয়ে চলেছে। অভূতপূর্ব্বকে বর্ত্তমানের অনুভূতির মধ্যে আয়ত্তকরা অল্প মানব-শক্তির পরিচায়ক নয়, অনন্য সাধারণ শক্তি, ধৈর্য্য ও সাহসিকতার বিজ্ঞপ্তি। অসাধারণ Yungwing'র পরিচয় সারা চীনের কাছে ঘনিষ্ঠ হলো; আর এই আত্মীয়তাকে আরও গভীর, আরো আন্তরিক করে তুল্‌লে তাঁর আত্ম জীবনী,—যা' শুধু একটা অভিনব জীবনেরই পরিচয় দেয় না;—নব-জাগ্রত তরুণ চীনের স্বপ্ন ও শক্তিরও পরিচয় দেয়। তাই তাঁর আত্ম-জীবনীর অংশ বিশেষ উদ্ধৃতকরার লোভ সংবরণ করা দুরুহ হ'ল।—

"১৮২৮ সালের ১৭ই নভেম্বর আমি জন্মাই। আমার দাদা পড়্‌তেন এক বিষম গোঁড়া Confucian স্কুলে; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এ ব্যাপার আমার কাছে রহস্যাবৃত যে, আমাকে ঐ রকম এক স্কুলে ভর্ত্তি না করে বিজাতীয় স্কুলে ভর্ত্তি করা হ'ল কেন? এ কাজ দেশের তখনকার অভিরুচির বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছু নয়।...... পুরাতন পথ হতে বিদায় নেওয়ার একটীমাত্র কারণ আমি পেয়েছি। চীনে বিদেশের সঙ্গে আদান প্রদান তখন মাত্র জমাট বেঁধে উঠ্‌ছে। সংসারাভিজ্ঞ পিতামাতা বোধ হয় ঠিক কর্‌লেন যে তাঁদের এক ছেলে ইংরাজী পড়ে বিদ্বান হ'য়ে মস্ত এক সরকারী চাকুরী পাবে আর তারই সুযোগে হয়ে উঠবে পৃথিবীর একটা গণ্যমান্য লোক।......

১৮৩৫ সালে, মাত্র ৭ বছর বয়সে বাবা আমাকে Macao-এ নিয়ে গেলেন। স্কুলে আমায় Mrs. Gutzlaff'র সাম্‌নে আনা হ'ল।······তাঁর স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আর দরদমাখা হাসি আমার মধ্যে বিপুল বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল; নব আবেষ্টনের মধ্যে আমি হতভম্ব হয়েছিলুম্। কিছুদিন পরে অনুভব কর্‌লুম, যেন আমার মধ্যে এক নতুন জগতের সৃষ্টি হ'চ্চে। 'মন কেমন করা'-ভাব কেটে গেল,—নব-বেষ্টনীর অভিনবত্বও ম্লান হয়ে এল; Mrs. Gutzlaff তখন তাঁর সহৃদয়তা আর সহানুভূতি দিয়ে আমার চিত্তহরণ করেছেন; আমি তখন তাঁকে মায়ের মত ভালবাসি।······

বাল্য জীবনের একটী ঘটনা আমি এ জীবনে ভুল্‌তে পারলুম না। স্কুল-বাড়ীর তিন্ তলায় আটক ছিলুম্। ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে খেলা কর্‌বার জন্য মাত্র ওপরের ছাদ্‌টি ছিল। বাইরে রাস্তায় যাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। ······যারা স্বাধীনভাবে খেলাধূলা কর্‌তো তাদের ওপর কেমন যেন হিংসা হ'ত'; ছুটীর পর তাদের আমোদ প্রমোদে যোগদেবার জন্য লুকিয়ে নেমে আস্‌তুম;—বাহির জগতের কিছু দেখবার অভিলাষ মনে নিয়ে।······মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পালাবার মতলব পর্য্যন্ত কর্‌লুম্। মেয়েরা ছিল আমার চেয়ে বড়। এ বিষম প্রস্তাবে অনেকে সহানুভূতিও দেখালে, কারণ, কঠিন নিয়মের পাকে পড়ে তখন সবাই চঞ্চল। ছ'জন আমার সহযাত্রীও হ'বার ইচ্ছা জানালে। ঠিক্ হলো

আমি একলা গৃহত্যাগ করে ঘাটে একটা বজরার বন্দোবস্ত করবো যাতে সাত জনেরই পালাবার সুবিধা হয়। ······কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ষড়যন্ত্র নিস্ফল হ'ল।

১৮৪০ সালের শেষাশেষি; তখনও Opium War চল্‌ছে; —বাবা মারা গেলেন। জীবনধারণের কোনও সংস্থান না রেখে মায়ের অক্ষম কাঁধে চারটী ছেলেমেয়ের ভার দিলেন চাপিয়ে। ······দাদা মাছের ব্যবসায় লাগ্‌লো, বোনটী গৃহস্থালীর কাজে সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌লো—আর আমি গ্রামে গ্রামে চিনির খাবার ফিরি করে বেড়াতে লাগ্‌লুম। মাত্র বার বছর বয়স হলেও ব্যবসায় আমার শৈথিল্য ছিলনা মোটেই। রোজ ভোরে উঠে বেরুতুম,—সন্ধ্যা ছটা'র আগে ফির্‌তুম্ না। দিনে প্রায় ৫।৬ আনা উপার্জ্জন করে মা'র হাতে দিতুম্। আমার এ' রোজগার আর দাদার সাহায্য, এই ছিল সংসারের মূলধন।

১৮৩৯ সালের নভেম্বরে Morrison School'র প্রতিষ্ঠা হয়—Rev. R. S. Brown'র তত্ত্বধানে।······১৮৪১ সালে আমি সেখানে ভর্ত্তি হই।······হঠাৎ ১৮৪৬ সালের শীতের সময় Rev. Brown চীন ছেড়ে চল্‌লেন। তাঁর নিজের এবং পরিবারের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমেরিকা প্রত্যাগমনের বন্দোবস্ত করছেন—এ কথা আমাদের জানালেন। স্কুলের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরের সম্পর্ক,—তাই শিক্ষা সমাপ্তির উদ্দেশ্যে পুরাতন কয়েকজন ছাত্রকে আমেরিকা নিয়ে যাবার অভিলাষ জ্ঞাপন করে বল্‌লেন

"যে যে যাবে, দাঁড়াও,"—সবায়ের দেহ, মন তখন গভীর নীরবতায় আচ্ছন্ন। প্রথমে উঠে দাঁড়ালুম আমি, তারপরে দাঁড়াল Wong Foon আর সব শেষে উঠ্‌লো Wong Shing.

পিতামাতার অনুমতি নেওয়া অতি আবশ্যক।—অনেক অনিচ্ছাসত্ত্বেও মা অনুমতি দিলেন। চোখ দিয়ে তাঁর অশ্রুর বন্যা বইলো। তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ দেখবার জন্য আরও তাঁর দুটী ছেলে আর একটী মেয়ে রইল, এই কথা বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম।

Capt. Gillespie'র কর্তৃত্বাধীন "Huntress" জাহাজে উঠ্‌লুম্—১৮৪৭ সালের জানুয়ারীর ৪ঠা তারিখে; তখন আমার বয়স ১৯ বছর।······অভূতপূর্ব্ব অনুকূল জলবায়ুর মধ্যে ৯৮ দিন যাপন করে—ঐ বছরের ১২ই এপ্রিল তারিখে—New Yorkএ পৌঁছালুম। ষোল বছর বয়সে যখন Morrison Schoolএ পড়ি; তখন আমি এক প্রবন্ধ লিখি—"নিউইয়র্কে কাল্পনিক জলযাত্রা"—সম্বন্ধে। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আর তিন বছর পরে আমার মানস-যাত্রা পরিপূর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়াবে। মনের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে, কল্পনায় তাই প্রতিফলিত হয় বিচিত্র রূপে রসে। কল্পনা এগিয়ে চলে বলেই সত্যোপলব্ধি অত সুন্দর হয়।

আমেরিকায় হিতৈষীদের পরামর্শ পেলুম্ যে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য কলেজে যে গচ্ছিত অর্থ আছে তারই সাহায্য নেওয়া আমার

কর্ত্তব্য। কিন্তু ধনগর্ব্বিত সভ্যজগতে আর দরিদ্রের আত্ম-মর্য্যাদা বলে কিছু নেই; তাই প্রত্যেক কায়িক বা আর্থিক সাহায্যের অন্তরালে আছে কৃতজ্ঞতার বন্ধন, হীন দাসত্বের অমর্য্যাদা। কলেজের fund এরও ছিল তাই। তার সাহায্য পেতে হ'লে এই মর্ম্মে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে যে, শিক্ষা সমাপ্ত করে, দেশে ফিরে আমি Missionary হ'ব। অঙ্গীকারাবদ্ধ হ'লে আমায়ও তাঁরা সাহায্য করে আনন্দিত হতেন; কিন্তু ধাতে তা' সইলো না। অন্তরে স্বাধীন সত্বা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো; স্বাধীনতাকে সঙ্কীর্ণ করে বড় হ'বার আকাঙ্ক্ষা আমার কোনও কালে ছিলনা তার ওপর আবার—Missionary হওয়াকে দেশের বড় কাজ বলে মানতুম্ না, আর নিজেকে স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলে বাঁধলে চীনের ভবিষ্যত জীবনযাত্রায় যোগদান অসম্ভব হ'বে নাকি? সুতরাং অস্বীকার করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমেরিকায় যদ্দিন ছিলুম—চীনের দীন হীন অবস্থায়ই শুধু চোখের ওপর ভাস্‌তো; মনের স্ফূর্ত্তির পথ রোধ করে থাকৃতো—করুণ চিন্তার কালো পাথর। হতাশ হয়ে একএক সময় ভাব্‌তুম্—একেবারে মুর্খ, অজ্ঞ হয়ে থাকাই আমার ছিল ভাল;—শিক্ষা সঙ্কীর্ণ মনকে আকাশের মত উদার করে দিয়েছে, দায়িত্বজ্ঞান জাগিয়াছে। অজ্ঞতার অন্ধতায় মানবের দুঃখ, দুর্নীতি চোখে পড়্‌তো কিনা সন্দেহ আর নির্ব্বিকার বিচ্ছিন্ন মন চঞ্চল হত না।...মনে মনে সঙ্কল্প করে ছিলুম্—যে, শিক্ষার পথে আমি যেরূপ সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ উপভোগ

করেছি চীনের ভবিষ্যৎ-সন্তানদেরও তদনুরূপ ব্যবস্থা কর্‌বো; পাশ্চাত্য শিক্ষার আনুকুল্যেই দেশ আমায় পুনর্জ্জীবন লাভ কর্‌বে,—সুসভ্য, শক্তিমান হ'বে। ভবিষ্যতের এই আদর্শ চীনই আমার ধ্রুবতারা। ঝড় ঝাপ্‌টায় দুঃখে কষ্টে কটাবছর কাটিয়ে দেশে ফিরে এসে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর্‌লুম। সুদীর্ঘ দশবৎসর বিদেশে কাটিয়েছি বটে কিন্তু জন্মভূমির স্নিগ্ধ ছবিটি দৃষ্টি থেকে একবারও সরাইনি, দেশের উন্নতি কল্পনায় ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তটুকুও কাটিয়েছি।

ফিরে এসে ছমাস Cantonএ কাটাই। তখন Canton বাসীরা প্রাদেশিক বিপ্লব সূচনায় সচেষ্ট, এই বিপ্লবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে বড়লাট Yehming নৃসংশ প্রথার আশ্রয় নিলেন। ১৮৫৫ সালের গ্রীষ্মে তিনি ৭৫ হাজার নরনারীর মুণ্ডচ্ছেদ করেন; এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নিরপরাধ। হত্যামঞ্চের কাছেই ছিল আমার বাসা। একদিন সেখানে গেলুম ভরসা করে,—চোখের সাম্‌নে বীভৎস দৃশ্য! মাটীর বুকে নর শোনিতের বন্যা! পথের দুধারে মুণ্ডহীন শবের পাহাড়, সৎকারের অপেক্ষায় রয়েছে।......দেশে ফেরার এক বৎসরের মধ্যে আমার তিনবার মত পরিবর্ত্তন হ'ল।...কিন্তু জীবনের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন কর্‌তে গেলে মাত্র কর্ম্মস্পৃহাই যথেষ্ট নয়, স্বপ্নেরও সংস্থান চাই। শান্তিহীন জীবনে এই সত্য বুঝে ছিলুম যে, যে কাজ করে যাব' তা শুধু ব্যাক্তিরই পরিপোষক

হবেনা, হ'বে স্বজাতির সমগ্র জীবনে আশীর্ব্বচনের মত শুভ আদর্শের গ্রহণ, বর্জ্জনের মধ্যেই হ'বে শাশ্বত আদর্শের প্রতিষ্ঠা।

কর্ম্মপথে সুযোগও ঘটে গেল যথেষ্ট, আমার এক বাল্যবন্ধু তখন রাষ্ট্র-জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, তাঁর নাম Tingyih Chang তাঁরই সহায়তায় প্রধান সচিব Wen Seang'র কাছে আমার প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করি। একটী প্রস্তাবে ১২০ জন ছাত্রকে আমেরিকায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই ছিল আমার শ্রেষ্ঠ কামনা। কিন্তু বিধির নজর তখন আমার ওপর বোধহয় ভাল ছিল না তাই সচিব-শ্রেষ্ঠ প্রাণ হারালেন আমার কর্ম্মোদ্যমের প্রারম্ভেই। হর্ষোচ্ছ্বসিত অঙ্গে মৃত্যু-শীতল স্পর্শ বুলিয়ে কে যেন আমায় অসাড় করে দিলে; সুধাপাত্র অধরের কিনারায় এসে হস্তচ্যুত হ'ল। কিন্তু একদম্ দম্‌বার পাত্র নয় বলে তখনও বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তি আমার অটুট্ ছিল। অপেক্ষা করতে অরাজী নই। সবুরে মেওয়া ফলে, ফল্‌লও তাই। ১৮৭০ সালে—শিক্ষা-সম্বন্ধে এক সরকারী তদন্ত-সমিতি বস্‌লো। আমিও তার এক সদস্য ছিলুম। আমার উপর প্রবাসী-চীনাছাত্রদের তদারকের ভার পড়্‌লো, তাদের উপযুক্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থাও আমিই করলুম্। ১৮৭২ সালের গ্রীষ্ম-শেষে প্রথম ৩০ জন ছাত্র প্রশান্ত মহাসাগরে 'পাড়ি জমাল';—১৮৭৫ সালের অবসানে ১২০ জনের অবশিষ্ট সবাই আমেরিকায় পৌঁছাল।

নতুন দেশে এসে চীনা-তরুণ মানসিক দুর্ভাবনার ভার হতে

নিষ্কৃতি পেলে। মুক্তির আনন্দে তারা উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠ্‌লো, আনন্দের উৎসের সন্ধান তারা তখন পেয়েছে !

*   *   *   *

আমেরিকায় ক'বছর বাসকরে এই তরুণরা পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে গেল, কর্ত্তৃপক্ষের মন তখন সংশয়ে দুলে উঠ্‌লো ; হুকুম হলো তাদের আশু-প্রত্যাবর্ত্তনের। শুধু— Yungwing আমেরিকায় রইলেন। হাজার হোক্, Yung Wing চীনের নব-অভ্যুদয়ের আশা ত্যাগ করেননি। ১৮৯৪ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি Reform Movementএ যোগদিলেন ; এই আন্দোলনের নেতারা নাকি ছিলেন চরমপন্থী— তাই তাঁদের পুরস্কারও মিল্‌লো যথেষ্ট। কয়েকজনের জীবন গেল, আর জন কয়েক হ'লেন দেশত্যাগী, Yungwing ও ছিলেন এই পলাতকদের মধ্যে। অন্তিমদিন পর্য্যন্ত আমেরিকায় কাটিয়ে—১৯১২ সালে তিনি মারা যান। তিনি স্বদেশে যে আন্দোলনের মাত্র বীজ বপন করে এসেছিলেন, তাঁর বন্দী জীবনে তা' শাখা-প্রশাখা-বহুল বৃক্ষে পরিণত হ'ল। শত সহস্র তরুণ চীনা ইউরোপ, আমেরিকায় চল্‌লো, জীবনীশক্তি আহরণ কর্‌তে ; যেন "নীল পাখী"র সন্ধানে চলেছে 'তিল্‌তিল্' মিতিলের দল। পরিচয় যখন আত্মীয়স্বজনকে অতিক্রম করে অনাত্মীয়, অপরিচিতের দ্বারে এসে পৌছায় তখন আত্মীয় স্বজনের অন্তর সঙ্কুচিত হয়, অ-পরিচয়ের বিভীষিকা তাদের শঙ্কিত করে তোলে ; কিন্তু

প্রচণ্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 'অজানা'র উদ্দেশে অভিসার চলে আস্‌ছে মনুষ্য সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত—হ'তে, আদাম যেদিন নিষিদ্ধ ফল আস্বাদন করেছিল বোধহয় তার আগে থেকেই। চীনে যখন পশ্চিমে তীর্থযাত্রার পরিকল্পনা হ'চ্চে মাত্র, তখন হতেই নব-পরিচয় ভীত চীনা নরনারীর মন সংশয়ের দোলায় দুল্‌তে আরম্ভ করেছে; তরুণচীনের অভিভাবকদল প্রবাস-যাত্রা ও যমালয় যাত্রা একই পর্য্যায়ে ফেল্‌তে সুরু করেছেন। আমাদের দেশেও প্রথম-বিলাত-যাত্রীরা 'ম্লেচ্ছ' বলে পরিগণিত হয়েছেন—সমাজ তাঁদের ছোঁয়াচ-লাগার ভয়ে নিজেকে সঙ্কীর্ণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। প্রথম প্রথম চীনেরও অবস্থা হয়েছিল ভারত বর্ষেরই অনুরূপ। সন্তানদের বিদেশ পাঠান, চীনা-পিতা-মাতাও বিপজ্জনক মনেকর্‌তেন। Yungwing কর্ত্তৃক আমেরিকায় প্রেরিত একজন ছাত্র বলেছিলেন—"সরকার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন কর্‌বে একথা জানা সত্ত্বেও দেশের লোকেরা সন্তানদের বিদেশ পাঠাতে কী রকম অনিচ্ছুক ছিল তার দৃষ্টান্তের অভাব হবে না।

"আমার মনে আছে, এক বন্ধুর বাড়ীর চাকর একদিন বল্‌লে, 'তখন আমার বয়স অল্প; গ্রামে একদিন এক রাজ কর্ম্মচারী এল' বাবা, মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমাকে তাঁরা শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠাতে রাজি আছেন কিনা? কিন্তু কোনও ক্রমেই তাঁরা সম্মত হলেননা। তাঁদের দৃঢ় ধারণা যে, কোনও চীনা সেখানে গেলেই, সে দেশের অধিবাসীরা তার ছাল ছাড়িয়ে,

পরিবর্ত্তে কোনও জন্তুর চাম্ড়া গায়ে লাগিয়ে দিয়ে, গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে 'বুনো মানুষ' বলে দেখিয়ে নিয়ে বেড়ায়"—

কিন্তু মনের কুসংস্কার চিরস্থায়ী হয় না,—তাই পশ্চিম-যাত্রায় চীনের বিরুদ্ধভাব নির্ম্মূল হ'তে বেশী দেরী হ'ল না—বক্সার বিদ্রোহের পর থেকে এসম্বন্ধে চীনা নরনারীর মনোভাব পরিবর্ত্তিত হল। ১৯০৭ সালে World's Chinese Students Journal'র সম্পাদক লেখেন—"৩০ বছরেরও আগে, যখন Yung wing আমেরিকায় ১২০ জন চীনা শিক্ষার্থী পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌ছিলেন, তখন অনেক যুবকই যেতে অস্বীকৃত হয়েছিল; কিন্তু আজ যদি মাত্র গুজব হয় যে বড়লাট একদল ছাত্রকে বিদেশ পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌ছেন, তা'হলে হাজার হাজার দরখাস্ত এসে জমা হয়। আজকাল তরুণরা—১০।১২ ঘণ্টা শিক্ষকতায় পরিশ্রম করে—পয়সা, টাকা'র—প্রত্যেকটী জমাতে আরম্ভ করেছে; জ্ঞানের সন্ধানে পশ্চিমে তীর্থযাত্রায় এই হ'বে তাদের পাথেয়।"

এ'র কারণ নিরূপণ করা দুরূহ নয়। আগে 'কৃতজ্ঞ সন্তানে'র গৃহছেড়ে প্রবাসযাত্রা ছিল নীতি বিরুদ্ধ। তার ওপর আবার পাশ্চাত্য জগত হতে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ দুই জগতের বিভিন্ন সভ্যতার বিচ্ছিন্নভাবকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিল; তাই বিদেশী সভ্যতার ছোঁয়াচে চীনা সভ্যতার বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কাও ছিল যথেষ্ট। চীন-জাপানের যুদ্ধের আগে প্রবাসযাত্রী ছাত্রদের অধিকাংশই সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছিল, যুদ্ধের আনুসাঙ্গক

সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে—চীনসভ্যতার উন্নতি কল্পনায় নয়; চীনের নিঃসন্দিগ্ধমন কালের ফেরে সবাইকেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখ্‌তে সুরু করেছিল। তারা দেখলে যে, অতীতে যারা তাদের অতিথি হয়ে এসেছিল মাত্র, আজ তারা ঘর দোর জুড়ে বসেছে। তারা দেখলে যে, ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা, ইটালি প্রভৃতি জাতি—এককালে যাদের সঙ্গে সম্পর্কের কোনও সূত্রই বর্ত্তমান ছিল না; আজ তাদেরই হত্যা করছে নির্ব্বিচারে, তাদেরই বক্ষ জুড়ে—আধিপত্য বিস্তার করেছে; তাদেরই ধনসম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে লুট তরাজ করে নিয়ে যাচ্ছে। এদের অমানুষিক শক্তি, যুদ্ধের উপকরণের প্রাচুর্য্যে,—অন্য কিছুতে নয়। এ জ্ঞান তাদের হয়েছিল বলেই চীনাগভর্ণমেণ্ট ১৮৭৬ সালে নৌ-বিদ্যা, আর রণপোত নির্ম্মাণ শিক্ষার জন্য একদল তরুণচীনা ছাত্রকে ইউরোপ পাঠিয়েছিল।

১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে চীনের রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে কত প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ, **Reform movement**, বক্সার-বিদ্রোহ প্রভৃতি চীনের তরুণমনকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেল; তার উপর আবার নির্ব্বাসিত নেতারা—বিদেশী চরম পন্থীদের সাহিত্য অনুবাদ করে চীনে প্রচার কার্য্য সুরু করে দিয়েছেন। তরুণচীন তখন ধৈর্য্যের শেষসীমায় উপস্থিত, তারা তখন আশা নিরাশার ক্রীড়নক; এই সব অনিশ্চিত মূহুর্ত্তের অন্তরে তারা উৎসুক দৃষ্টিতে পশ্চিম মুখে চেয়ে ভাব্‌ছে, পাশ্চাত্যের

সোনার কাটির পরশে—কখন তাদের সব সমস্যার সমাধান হবে? তখন থেকেই পশ্চিমের জ্ঞান মন্দিরে তারা চলেছে তীর্থ যাত্রায়। সে সময়ে নিষ্ঠুর হতাশার বর্ণনা প্রবন্ধে প্রকাশিত হ'তে লাগ্‌লো। 'Star'এ একজন লিখলে—"চীন জাপানের যুদ্ধ যখন বাধলো তখন আমার ১৯ বছর বয়স। এবার চীন ভীষণভাবে পরাজিত হয়েছে!......সারা দেশের লোক তখন দারুণ দুঃখবাদী। তাদের ভাব ভঙ্গিতে তা প্রকট হ'য়ে উঠলো। সংস্কার আর পরিবর্তনের চীৎকারে তখন আকাশ ছাওয়া। ১৮৯৮ সালে Peking Reform Movement'র সুরু হলো; তিনমাস না যেতে যেতেই, রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধআন্দোলন এর গতিরোধ করলে। নেতাদের অনেকে প্রাণ দিলেন; জনকতক জাপানে পালিয়ে কাগজ লিখতে আরম্ভ করলেন। আমরা তখন হতাশ হয়ে পড়েছি, ভাবছি চীনের আর কিছু আশা করবার নেই; শাসনতন্ত্র একেবারে পাঁকে ভরা। যাই হোক্ মাথা যাবার ভয়ে আর উচ্চবাচ্য করিনি। দু বছর পরে বক্সারবিদ্রোহ এলো, দেশের অবস্থা হ'ল মন্দতর। এ রকম হতাশ অবস্থা দেখে জন-কয়েক ছাত্র আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করলে! বন্ধু Hwang Li-sung ও ছিল তাদের মধ্যে একজন।......

"আমরা জানতুম যে জাপান আমাদের চেয়ে শক্তিমান। দেশের মঙ্গলকামনায় আমাদের একদল জাপানে চল্‌লুম্ শিক্ষার

উদ্দেশ্যে। আমাদের মধ্যে অনেকে জাপানী কথা পর্য্যন্ত বল্‌তে পারতুম না, তা সত্ত্বেও আমরা চল্‌লুম।”—

চীনের বিপুল ছাত্র-প্রবাহ তখন পৃথিবীর সব সুসভ্য দেশ ছেয়ে ফেলেছে; তাদের মুক্তি অভিযান পৃথিবীর অনন্ত-বুকের উপর এসে ভাবছে তাদের পথ-নির্দ্দেশ করবে কারা? দিশাহীন হয়ে ঘুরে মর্‌তে তারা রাজি নয়, দিগন্ত উদার পৃথিবীর বুকেই তারা অভিযানের প্রশস্ত-পথ গড়ে নেবে। এই অভিযান যখন ঔৎসুক্যের উন্মাদনায় স্বীয় প্রতিকৃতি পৃথিবীর পটের পরে, মানবের দৃষ্টি সামনে প্রতিফলিত করেছে তখন ডাঃ C.T. Wang আমেরিকায়। তিনি এক বর্ক্তৃতায় বলেন, “সেই সময়ে চীনজুড়ে এক অসাধারণ আন্দোলনের সূচনা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তার আর জুড়ী নেই। তরুণ সম্প্রদায়ই হচ্চে জাতীয় জীবন। আর চীনা তরুণ তখন ঘর ছেড়ে বিরাট বাইরে এসে নেমেছে; দেশবিদেশে ছুটেছে পৃথিবীর শিক্ষার বিষয়বস্তু আহরণ কর্‌তে। ইউরোপের “রেনেসাঁস্” আন্দোলন Dark-Ageকে যবনিকার অন্তরালে বিতাড়িত করেছিল; কিন্তু সেও এ আন্দোলনের সমতুল্য নয়।”

“কোনও অতীত শতাব্দীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—বিশিষ্ট জাতির শত সহস্র জ্ঞানলিপ্সু তরুণদের পৃথিবী পর্য্যটনের বর্ণনা পাওয়া যায় কি? ১৯০৬ সালে শুধু Tokio তে ১৫ হাজারেরও অধিক চীনা-ছাত্র ছিল। আমেরিকা ইউরোপে যাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না

অনেক কারণে, কিন্তু সেখানেও ১৯২৫ সালের ভেতরেই প্রায় ১০ হাজার চীনাছাত্র এসেছে—একটু আলোর সন্ধানে, ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করবার কামনায়।......যৌবন-অন্তর তখন মহান্-আদর্শে অনুপ্রানিত। যে সব যুবা দেশে ফিরে এলো—তারাও পূর্ণ-শক্তিতেই মাতৃভূমির পরিচর্য্যায় রত হ'ল।"

সুদূর-দেশের অধিবাসীর চেয়ে প্রতিবেশীই জীবনের নিত্য কর্ম্মে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। আমেরিকা, ইউরোপ চীনের হাজার হাজার মাইল দুরে কিন্তু জাপান তার অতি নিকট তাই দেখি চীন যখন সারা পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত তখনও চীনের আকাশ ছেয়ে ধ্বনিত হচ্চে—"জাপান যা করেছে চীনও তাই করতে সক্ষম।" অসংখ্য তরুণচীনা জাপানে চল্‌লো; তার শক্তির সন্ধান নিয়ে নিজেদের পথভ্রষ্ট-শক্তির পথনির্দ্দেশ কর্‌তে। জাপান প্রবাসী চীনা বালক, যুবার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এক পর্য্যটক লিপিবদ্ধ করে গেছেন—"১৮৯৬ সাল থেকে সংখ্যাহীন চীনা ছাত্র জাপানে আসছে তাদের বিজেতার শিক্ষা-নিকেতনে প্রবেশ লাভের আশায়।......এদের মধ্যে অনেকেই আস্‌ছে পল্লীগ্রাম থেকে।...অর্দ্ধেক এদের মধ্যে নিজেদের ব্যয়ভার বহন করে নিজেরাই, বাকী সব হয় জাতীয় গবর্ণমেণ্টের না হয় প্রাদেশিক সংঘের সাহায্য পায়। বয়স এদের ১৩ থেকে ৮০'র মধ্যে। জাপানে তারা সরকারী, বেসরকারী সব বিদ্যালয়েই পড়্‌তে পায়। অধিকাংশই পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, সমর-বিজ্ঞান

কিম্বা ডাক্তারী; বাকী সব শিল্প শিক্ষা করে। সবাই প্রায় এসেছিল জাপান সম্বন্ধে কিছু না জেনেই; উদ্যোগ আয়োজন কিছু না করেই। প্রায় আর্দ্ধেক বছর দুয়ের পরে ফিরলো সামান্য কিছু শিখে। অল্পবিদ্যা এদের পক্ষে ভয়ঙ্করী হ'ল, যে কোনও অদ্ভুত উপদেশেই এরা গা' ভাসান দিত। ১৯০৫ সালে ৪১১ জন জাপানে শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশে এসে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন।

জাপানে চীনা-ছাত্র-জীবনের কেন্দ্র হচ্চে Tokio। সেখানে এদের এক সংঘ আছে ২,৫০০ তার সভ্য। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কথাবার্ত্তার অবাধ অনুমতি এখানে। রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা সুচারুরূপেই এখানে হয়; গভর্ণমেণ্টও দুষ্কর্ম্ম করে নিষ্কৃতি পায় না। এই সংঘকেই কেন্দ্র করে সারা চীনব্যাপী নব্য প্রভাবের বিস্তারের চেষ্টা হয় বই, কাগজ ও পুস্তিকার সাহায্যে।......জাতীয় একতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এরা অক্লান্ত পরিশ্রম কর্চ্ছে।"—

চীনের তরুণ আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট হচ্চে এই, যে শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়েও বিদেশে বসেই চীনাতরুণ দেশের আন্দোলনের প্রাণসঞ্চার করেছে। ভবিষ্যত উন্নতির উচ্ছ্বাসে বর্ত্তমানকে ছেড়ে দেয়নি; সমান ভাবে কাজ করে এসেছে মাতৃভুমির জন্য ঘর বাহির দু'দিক থেকেই। এই কারনেই Tokio বিপ্লবীর কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

মাঞ্চু-গবর্ণমেণ্ট, দুনীতিপূর্ণ ছিল। চীনে বসে তার বিরুদ্ধ-

সমালোচনা একরকম অসম্ভব ; তাই বিদেশে বাধাহীনতার সুযোগে নেতারা কর্ম্মশক্তি কেন্দ্রীভূত করলেন। প্রচলিত শাসন তন্ত্রের প্রতি অসন্তোষ কাজে, ভাষায় প্রকাশিত হ'ল' সারা চীন জুড়ে। দেশের এই বিরাট জাগরণের সুযোগে Dr Sun Yat-sen, Tokio তে বিপ্লব সমিতি গঠন করেন। "The People" নামে এক সংবাদ পত্র ছিল এই সংঘের মুখপত্র। এই কাগজটীর প্রচার অসম্ভব ছিল; ১৫০,০০০এর গ্রাহক সংখ্যা। তরুণ চীনের শক্তিকে যখন এইসব উপায়ে সংহত করবার চেষ্টা চলছে—তখন সংশয়-ক্ষীণ, ভীরু রাজশক্তির দৃষ্টি এদের উপর পড়লো Tokioর Board of Education অনুরুদ্ধ হল জাপান প্রবাসী চীনাছাত্রদের কঠিন নিয়মে বাঁধবার জন্য। গায়ের জোরে, Sun Yat sen'র বিপ্লব সমিতির মুখপত্র The People'র ছাপা বন্ধ করা হলো। রাষ্ট্রশক্তির এরূপ প্রতিকুলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রায় অর্দ্ধেকেরও অধিক চীনাছাত্র জাপান ছেড়ে দেশে ফিরে এলো। প্রত্যাগত ছাত্রদের কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত হ'ল শিক্ষা প্রচারের বিপুল অনুষ্ঠানে। চীনের সহর গ্রাম জুড়ে ছোট বড় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল—; জাগরণের যাদুস্পর্শে বাণীর কমল-বন তখন প্রস্ফুটিত। এদিকে যেমন জাপান-যাত্রী চীনার সংখ্যা কমতে লাগলো, অন্যদিকে তেমনই বেড়েই চললো আমেরিকা ইউরোপ যাত্রী ছাত্রের সংখ্যা। মাঞ্চু রাজার অলঙ্ঘ্য আদেশে ১৮৮১ সালে ১২০জনের সবাই ফিরে আসবার পর তীর্থ যাত্রার স্রোতে মন্দাপড়ে

গেলো, কিন্তু তা অস্থায়ী, তাই জাগ্রত সাগরের চঞ্চল জলস্রোত এসে এ ভাঁটা পড়া অচঞ্চল প্রবাহটিকে জোয়ারের দুর্দ্দম গতিতে প্রাণবন্ত করে তুললে। ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে— প্রায় সাড়ে পাঁচহাজার চীনাছাত্র শুধু আমেরিকায় শিক্ষালাভ করতে এসেছে। তাদের পরিবর্দ্ধমান সংখ্যার একটী তালিকা নিচের দেওয়া গেল।

১৮৯৮ সাল	৬ জন
১৯০৫ ,,	১০৬ ,,
১৯০৬ ,,	৩০০ ,,
১৯১০ ,,	৬৫০ ,,
১৯১৪ ,,	৮৪৭ ,,
১৯১৮ ,,	১৫০০ ,,
১৯২২ ,,	২৬০০ ,,

উপরিউক্ত তালিকাটি চীনের যৌবন-অভিযাত্রীদের আন্তরিক গভীরতার অভ্রান্ত সাক্ষী। নানা বিপক্ষতায় বিপর্য্যস্ত হয়েও— পথের বুকে পা তাদের টলেনি; তামসিকতার অবসাদ এসে তাদের যুদ্ধযাত্রা নিষ্ফল করে দেয়নি। M. E. S. Yui বলেছেন —"Boxer বিদ্রোহের আগে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্য শিক্ষার উৎসাহ কখনও দেয়নি। ১৯০০ সালে যখন বিদ্রোহের যবনিকা পড়ে গেল, তখন তার সম্মতির প্রকাশ হ'ল—ছাত্রদের বিদেশ যাত্রার অনুমতি জ্ঞাপনে।......কিন্তু প্রবাসযাত্রী ছাত্র সংখ্যা

সব চেয়ে বেড়েছিল ১৯১১ সালের বিদ্রোহের পুরস্কার,—প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই। আজকাল শতাধিক চীনা বালকবালিকা প্রতি বছর প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে যাচ্ছে।”—

গত মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপেও নেহাৎ অল্প চীনাছাত্র ছিল না। শুধু ‘গ্রেট্‌ব্রিটেনেই ছিল ৩৫০ জন, ফ্রান্সে ১০০, বেল্‌জিয়ামে ৬০, অষ্ট্রিয়াতে ২০, রাশিয়াতে ১৫, আর হল্যাণ্ডএ ২০ জন। যুদ্ধ থেমে যাবার পরেও প্রচুর চীনা ইউরোপে যায়। তাদের অধিকাংশই ছিল ফ্রান্সে, প্রায় ২,০০০ ;—এদের মধ্যে আবার প্রায় ১,৫০০ এসেছিল—” Diligence-Labor-Simplicity Educational Societyর সম্পর্কে। এই বিরাট সংঘটী ১৯১৫ সালে, Pekingএ, Dr. Tsai Yuan peiর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, এর উদ্দেশ্য ছিল প্রবাসে চীনাছাত্রদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করা। ব্যয়ভার তাদের নিজেদেরই বহন করতে হ’ত’,—কায়িক-শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা। এই বিপুল ছাত্র-প্রবাহের পশ্চিম-পানে ধাবিত-হওয়া শুধু চীনেরই যৌবন অভিযানের আত্মপ্রকাশ নয় ;—সারা মানব জাতীর সভ্যতা ইতিহাসের একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা। সাগর-গামিনী নদী-প্রবাহের প্রত্যেক জলবিন্দুটী চায় বিরাটের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে নিঃশেষ করে দিতে—; কিন্তু চীনের এই ছাত্র-প্রবাহের চরম লক্ষ্য ছিল আত্মশুদ্ধি,—আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ করা—; যাতে

সে শুধু পশ্চিমের বিপুল সভ্যতা সমুদ্রে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে না-বসে, কারণ তাকে আবার ফিরতে হবে প্রাণের সমস্ত আবেগের সঞ্চয় অক্ষুন্ন রেখেই উল্টো পথে, পূবের মুখে, যেখানে তার যুগ যুগান্তের অমর মা অন্তরের সুধাভাণ্ড তস্করের কলঙ্কিত হাতে অর্পণ করে রুক্ষদৃষ্টি দিয়ে অনন্ত সমস্যার সীমারেখা খুঁজছে। মাতৃভূমির বর্ত্তমান দুঃখ-কালো দিনগুলিকে সুখের আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলাই ছিল এদের ধর্ম্ম। একজন প্রত্যাগত চীনাছাত্রের ডাইরীর মর্ম্ম এইরূপ—

"১৯২১ সালে আমেরিকায় আসবার আগে কিছুদিন সংহাইয়ে কাটাই। সেখানে আমরা ১৬০ জন ছিলুম আমেরিকা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সাংহায়ে যে ক'দিন ছিলুম প্রচুর অভিনন্দন পেয়েছি বিভিন্ন সংঘ সমিতির কাছ থেকে—; সব অভিনন্দনেরই গোপনবাণী ছিল "নব্য-চীনের ভবিষ্যৎ তোমরাই"।

"জাহাজে উঠলুম। আত্মীয়, বন্ধু, শিক্ষক, সহপাঠী সবাই বক্তব্য শেষ করলেন। গতিশীল জাহাজ, স্থল আর জলের অভিন্ন মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করলে। সবায়ের চোখে জল। সে অশ্রুতে ছিল নবীন চীনের আশাভরসায় আভাষ।"

অপরিচিতের কাছে কিছুদিন বাস করতে গেলেই তার আচার অনুষ্ঠানকে অনুকরণ করতেই হয়, নেহাৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব হলেও। চীন-সন্তান আমেরিকায় আগন্তুক মাত্র; কিন্তু সেখানে তাকে এক আধদিন নয়, দু'চার বছর অতিথি হয়ে থাকতে হবে,

সুতরাং অপরিচিত আচার ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তার একান্ত আবশ্যক। তাই যখন সরকার নিযুক্ত Commissioner আমেরিকা প্রবাসী চীনাছাত্রদের পর্য্যবেক্ষণে এলেন, তিনি স্পষ্ট দেখলেন যে তারা বদ্‌লে গেছে! আজ তারা 'base ball' খেলতে চায়, কলেজে পড়া ছেলের মত বুক ফুলিয়ে চলে, আবার আমেরিকার তরুনীদের সঙ্গে প্রেমালাপও করে? তাঁর রক্ষণশীল অন্তর শঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। বাহ্যিক ব্যবহার আর চিন্তাধারায় যে কত ওলটপালট হয়ে গেল, বিদেশে এসে,—তার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত লেখাগুলিতেই বর্ত্তমান,—

"১৯১০ সালের গ্রীষ্মে যখন আমেরিকায় এসে পৌছালুম্—তখন আমার বয়স ২১ বছর।......উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যেই এখানে আসা।......সুদূর প্রবাসে এসে দেশের কথা বেশী করেই মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো। ঘরে বসে ঘরের ছবিকে স্পষ্ট করা যায় না। বাইরে বসে তাই ঘরের চিত্রটী আরও স্পষ্ট ও সজীব দেখতে পেলুম্। দেশে বসে দেশের সভ্যতাকে হেঁয়ালী বলে মনে হ'ত,—বিদেশে কিন্তু চীনের প্রাচীন-সভ্যতার সৌন্দর্য্য দিনের আলোর মত উপভোগ করেছি। গৃহের বিভীষীকার তাড়নায় আমেরিকায় ছুটে এসেছি—কিন্তু কল্পনায় আমেরিকার যে আদর্শ-মূর্ত্তি দিয়েছিলুম্—বাস্তবের আমেরিকা তা' নয়—; অনেক হিসাবে আমার স্বদেশেরও পিছনে।

'China Town'এ গিয়ে শিউরে উঠলুম্,—আমাদের

স্বজাতীর প্রতি আমেরিকান্‌দের ব্যবহার দেখে! জাতি-বিদ্বেষ সেই আমার প্রথম চোখে পড়্‌লো। Missionary বন্ধুরা দেশে যা' প্রচার করেন তার সম্বন্ধে সেই দিন থেকেই সন্দেহ জাগ্‌লো।......

আমার ধর্ম্ম-মতও বদ্‌লে গেল। চীনে যদ্দিন ছিলুম্‌—তদ্দিন ধর্ম্ম-বিশ্বাস অন্ধছিল, কুসংস্কারে ভরা; কিন্তু এখানে এসে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মিশে বুঝ্‌লুম্‌ যে, আমেরিকান্‌রাও কুসংস্কার বর্জ্জিত নয়; ধর্ম্ম বিষয়ে তারাও ভীষণ রক্ষণশীল। অনেকেই নামে মাত্র ক্রীশ্চান্‌। তারা নিজেদের অপরের চেয়ে বড় বলে মনে করে।"-

এই সত্যোপলব্ধি সত্যই আনন্দের বস্তু। নব-পরিচয়ের মোহে আত্ম-হারা না হয়ে, এদের আত্মোপলব্ধিই হয়েছে। আর একটী চিঠির মর্ম্ম এইরূপ—

"১৯২১ সালে Fukien University'র গ্রাজুয়েট্‌ হয়ে আজ ৩ বছর হ'ল আমেরিকায় এসেছি। এই তিন বছরের মধ্যেই জীবনে আমার প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটেগেছে। এই অল্প-কালের পরিবর্ত্তনের কাছে গত ২১।২২ বছর কিছুই নয়। প্রথমতঃ দেশের রাজনৈতিক গোলযোগ হ'তে নিষ্কৃতি পেয়েছি। এই গোলযোগের অধিকাংশই ভাব-প্রবণতা-প্রসূত।......

"চীন সম্বন্ধে ধারণা আমার অনেকখানি বদ্‌লে গেছে। আজ আমি স্বদেশের ভবিষ্যত, তা'র সুন্দর সভ্যতা আর গতিশীল

আন্দোলনে আশান্বিত। অপরপক্ষে একথাও বুঝেছি যে প্রভূত পরিবর্ত্তনের দরকার। যৌবনঅভিযানের পথে পরীক্ষকের সুক্ষ্ম-দৃষ্টি চাই।

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মধ্যে একটা বিপ্লয সংঘটিত হয়েছে। এদেশে আস্‌বার আগে আমি একজন অনুরক্ত ক্রীশ্চান্ ছিলুম্। এদেশে সংখ্যাহীন ভণ্ড ক্রীশ্চান্ আর এই ক্রীশ্চান্-খ্যাত জাতিদের পরস্পর যুদ্ধ-অভিযান দেখে সবের ওপরেই সন্দেহ হচ্চে। এরা মোটেই বুদ্ধিমান নয়। আমি এসব কুসংস্কার থেকে মুক্তি চাই। দেশের Missionaryদের ওপর মনোভাবও বদ্‌লে গেল। এখন বুঝ্‌ছি চীনে তারা ভুল পথ অবলম্বন করেছে।

"মনে'র এ সংশয়, সন্দেহের দোলা'কে থামাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ক্রমশঃ Prayer (প্রাথনা) বন্ধ কর্‌লুম্। Confucius এবং অন্যান্য পণ্ডিতের কথা খুব ভাবতে লাগ্‌লুম্!...... আমার এই বিশ্বাস যে, প্রত্যেক ধর্ম্মই, বৌদ্ধ, ক্রীশ্চান্, কন্‌ফুসিয়ান্ যাই হোক্‌না কেন,—এক বিশিষ্ট সভ্যতার ফল। সভ্যতাও যেমন বিভিন্ন ধর্ম্মও তেমনই। এক ধর্ম্মকে আর এক ধর্ম্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবা'র কোনও কারণ নেই। বিরুদ্ধভাব না থক্‌লে প্রত্যেকেরই কিছু দান কর্‌বার আছে।

চীনা সভ্যতায় নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করলেও—, এ সম্বন্ধে আমার অভিমত একটু নতুন রকমের। আজ বুঝ্‌তে পারছি যে,—যখন চীনে ছিলুম্ সভ্যতা-গৌরব তখন ছিল

অজ্ঞানতাপ্রসূত ; ঘরের গোলযোগে তাকে ভাল করে বুঝ্‌তে পারিনি। আমার বিশ্বাস, পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহায্যে আমাদের সভ্যতাকে নতুন করে গড়্‌তে হ'বে। সুখের বিষয়, এই নব-সভ্যতার সন্ধানেই যৌবন অভিযান চলেছে।......আমেরিকান্ বন্ধুদের ধারণা, তাঁদের সভ্যতাই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অপরের কাছে শিক্ষণীয় তাঁদের কিছুই নেই। এই সঙ্কীর্ণতাকে আমি ঘৃণা করি। তাদের মত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'তে আমি চাইনি ; সত্যের সাক্ষাৎ-দর্শনই আমার কামনা।"—

পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রখণ্ডে যে সত্যটী প্রকট হয়ে উঠেছে তা'তে প্রমাণিত হয় যে, তরুণ-চীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিছক কল্পনার হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করেছে—অভিজ্ঞতার প্রসাদে। হয়ত' কল্পনায় তারা আদর্শ-চীনের যে ছবি এঁকেছিল দেশের ব্যথাতুর গৃহকোণ্‌টীতে বসে,—তার সব রঙ্‌টুকুই ছিল অসম্ভব ; কিন্তু বিদেশে বাধাহীনতার আনন্দে আর অভিজ্ঞতার সাহায্যে আদর্শ-কল্পিত মাতৃ-ভূমির চিত্রটীর ওপর কিছু বাস্তব কিছু সম্ভব রঙ ফলাতে সক্ষম হয়েছিল। এম্নিকরে চীনা-তরুণ নিজের ভবিষ্যৎ জীবনকে দেশের কষ্টসাধ্য উন্নত জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত করে ফেলেছিল। এই লেখাটীতেও তা' প্রতিফলিত হয়েছে,—"বরফের টুপী পরা Alpine পাহাড় ছাড়িয়ে তুর্কী রাজ্য। এ'র সহরগুলি এখনও বিপর্য্যয়ের আতঙ্ক হতে সাম্‌লে উঠ্‌তে পারেনি, যেন মাত্র গত অতীতেই সে রক্তের উন্মাদনায় মত্ত

ছিল, আজও তার স্মৃতিতে শিউরে উঠ্‌ছে! এই তুর্কীকেও অতিক্রমকরে—পারস্যদেশ আর তার রাজধানী Teheron; আবার তাকেও ছাড়িয়ে সুদূর পূর্ব্বদিকে পড়ে—বিরাট চীন-সাম্রাজ্য। এই বিপুল চীনের দিকেই আমাদের উৎসুকদৃষ্টি আবদ্ধ,—এ আমাদের পূর্ব্বপুরুষের আশ্রস্থল আমাদের জন্মভূমি, চীনের কৃতজ্ঞ পুত্রকন্যার গৌরবমণ্ডিতা দেবীমূর্ত্তি!......এখন আমরা বিদেশে।......কেউ আমেরিকায় যাচ্ছে, কেউবা আস্‌ছে গ্রেট্‌ব্রিটেনে, আর কেউ চলেছে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, বেল্‌জিয়াম্‌, রাশিয়া কিম্বা অষ্ট্রিয়াতে। দেশ বিদেশের বিভিন্ন যায়গায় ছড়িয়ে থাক্‌লেও আমাদের লক্ষ্য ও আশা অভিন্ন। দেশ আমাদের দুর্ব্বল কিন্তু মন গর্ব্বিত হয়ে ওঠে যখন দেখি, ঝড়্‌ঝাপটায় ৪ হাজার বছরেরও অধিক কাটিয়ে সে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।......তাকে আবার অতীত-গৌরবের উপযুক্ত কর্‌তে হ'লে—তার সুপ্তিভঙ্গের দরকার। এই বৃদ্ধ রাজ্যকে যৌবনে পুনঃ অভিষিক্ত করবার দায়িত্ব আমাদেরই। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যই আমরা সম্পন্ন কর্‌বো।.. ...চীনের অভিযান সুরু হয়েছে বেশ দ্রুত-ছন্দেই।.........দেশের সমস্যা এখন চরম—জীবন-মরণের সমস্যা।......এই পাশ্চাত্য-সভ্যতার আশ্রয়ে বসেই আমাদের বিচার এবং নির্ব্বাচনের শক্তির পরিচয় দিতে হ'বে! ......এই উপায়েই সর্ব্ব-কাম্য সভ্যতার প্রাপ্তি সম্ভব হবে।...... পূবে'র যদি পশ্চিমের কাছে কিছু গ্রহণযোগ্য থাকে ত' আমরাই

তা' নেব', আর পশ্চিমের যদি পূবে'র কাছে শিক্ষণীয় কিছু থাকে ত' আমরাই তা' দেব'।...আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল আমাদেরই দেশের ভালমন্দের উপাদান হবে।......পরস্পরের মধ্যে নির্ভরতা ও আত্মীয়তার বন্ধনে আমরা হ'ব এক,—অখণ্ড।"

দেশের উন্নতি কামনায় বিভিন্ন চীনা-তরুণের স্বার্থের সমন্বয় ঘটেছে। ভারতবর্ষের মত চীনেরও বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রচুর। প্রাদেশিক আচার ব্যবহারে পার্থক্য আছে, তার ওপর আবার ভাষার পার্থক্য। কিন্তু এরূপ স্বাভাবিক প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও তাদের মিলনে ব্যতিক্রম ঘটেনি। সমস্যা সারা চীনজুড়ে, প্রদেশ বিশেষে নয়। সবায়েরই ঘরে বাইরে একই অভিজ্ঞতা, এক আশা, এক স্বপ্ন; সুতরাং কর্ম্ম পথও এক। সেখানে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে তারা পরস্পরের হাত ধর্‌তে সক্ষম হয়েছে। তাই আজ দক্ষিণ চীন, উত্তর চীন কেউ নেই, আছে—শুধু চীন, বিরাট বিপুল, প্রবুদ্ধ,—যৌবন-অভিযানের জাগ্রত জীবনে অতীতের বোঝাপড়ায় নিবিষ্ট, ভবিষ্যতের কল্পনায় উজ্জ্বল।

চীনা-তরুণ পরস্পরের যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে অসংখ্য সাময়িক সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। তাদের অন্তরের প্রাদেশিকতার আসন আজ অধিকার করেছে—জাতিয়তা, আন্তর্জ্জাতিকতা।

১৯০৫ সালে এই তরুণ ছাত্রদের Amherst-এ এক অধিবেশন

হয়। সেই সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর সম্মিলনের কারণ ও বর্ণনা এইরূপ—

"এই সব চীনেরা পুরোপুরি আমেরিকান্ পরিচ্ছদে আবৃত। দেশের সেই ঝল্‌ঝলে পায়জামা অঙ্গে নেই। তাদের মধ্যে পণ্ডিত, খেলোয়াড়, বলিষ্ঠ সবাই আছে। তাদের কথ্য-ভাষা বিভিন্ন, তাই সবাই ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা কইছে। তাদের মধ্যে এমন ছাত্রও আছে যারা আমেরিকান্ ইউনিভার্সিটীর শ্রেষ্ঠ সম্মান আমেরিকান্-দেরই হাত হ'তে ছিনিয়ে নিয়েছে। সবাই একই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। সবাই চায়—চীন—'নব্য-চীন'।"

চীনাতরুণ পশ্চিম মুখে ছোটবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত চীনে অনেক বিপ্লব, অনেক আন্দোলন ঘটে গেছে। অনেক দিনের ২৪ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিহীনতায় দুঃসহ হয়ে উঠেছে। বিদেশে বসে, হাজার হাজার মাইলের অন্তরালে চীনা-তরুণের মনও তখন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। পড়ায় মন বসেনি, খেলায় উৎসাহ আসেনি, সব আনন্দই ম্লান হয়ে গেছে গুরুভার বিষন্নতার চাপে। প্রিয় যে, তার ভাবনা ভোলাতে অনন্ত ব্যবধানও সক্ষম নয়। বিদেশে সুখ, সজ্জার মধ্যেও চীনা-তরুণের দৈনন্দিন জীবন দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত উঠেছে, কখনও সে অন্তরের নিগূঢ়-বাসনাটী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছে অপূর্ব্বছন্দে। ১৯০০ সালে প্রবাসী একজন ছাত্র লেখে—

চীনের যৌবন অভিযান

জাগরণের লগ্ন এলো, শুভ,—
চক্ষু মেলি জাগো প্রাচীন চীন্ ।
স্বপ্ন-নিশার জীবন শেষে আজ
আলোয় মাতে গৌরবেরই দিন্ ।।

দীর্ঘ-নিশার সুপ্তি গভীর টুটে'—
মৃত্যু ত্যজি আজকে এসো ছুটে !
অতীত ভোলো, হোক্না মহান্ সে ?
বর্ত্তমানে স্বপ্ন দেখা মিছে ।
বিজয়-গাথা বিস্মৃত সে হোক্—
অতীত, ভোলা ; থাকুক্ পড়ে পিছে

সাম্‌নে এলো বর্ত্তমানের কাজ—
তুচ্ছ করে মৌন র'বে আজ ?
শত্রু অযুত তোমার চারিধারে—
বাঁধ্‌ছে ক'সে শিকল দিয়ে দেহ ।
সুপ্তি ছেড়ে ছিন্ন কর তারে ;
বন্দী হয়ে থাক্‌তে পারে কেহ ?
ওরা তোমার রক্ত-আঁখি দেখে
পালাক্, চোরাই-জিনিষ হেথায় রেখে' ॥

জাগরণের লগ্ন এলো শুভ
চক্ষু মেলি জাগো প্রাচীন চীন্ !

ন্যায্য তোমার রাজ্য-ছায়া তলে
আলোয় ভরুক্ বর্ত্তমানের দিন্!!
জাগার সাড়ায় মাত্‌লে স্বদেশ-ভূমি,
বল্‌বে সবাই—"দেখ স্বাধীন তুমি।" *

কবিতাটী আন্তরিকতায় ভরা; বিদেশে বসে স্বদেশের স্বপ্ন দেখে দিন গুজ্‌রান করা সম্ভব হয় তখনই, যখন প্রাণ স্বদেশ প্রেমে পরিপূর্ণ থাকে। চীনের অনেক আন্দোলনই প্রবাসী-চীনা-ছাত্রদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এটাই চীনের যৌবন-অভিযানের বিশেষত্ব। ১৯১১ সালের বিপ্লবানলে যারা ইন্ধনের সংস্থান করেছে তারা অধিকাংশই ছিল বিদেশে। এমন কি বিপ্লব-নেতা Sun Yatson ত' তখন চীনের বাইরে!

স্বদেশকে আধুনিক জগতের সমকক্ষ করবার কল্পনায় অসংখ্য তরুণ-চীনা বিদেশে এসেছে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ-বস্তুকে আহরণ করতে। চীনের ভবিষ্যতই তাদের স্বপ্ন; স্বকৃত বনবাসে বসে সেই স্বপ্নোদ্ধারের চেষ্টায় তারা ব্যস্ত। দেশকে পুনর্জ্জীবিত করার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে।

যাত্রীরা যখন তীর্থ সমাপন করে গৃহের দরজায় এসে উপস্থিত হয়, তখন গৃহকে নতুন করে দেখ্‌বার আকাঙ্ক্ষাই তাদের মনে জাগে। অজ্ঞাতপূর্ব্বের সঙ্গে তাদের জানা শোনা হয়ে গেছে, সে পরিচয়ে তাদের নিজেকে নতুন করে দেখবার সুযোগ হয়েছে; তাই যখন সেই পুরাতন গৃহটীর ছায়ায় এসে তারা দাঁড়ায়;

তখন মনি তাদের সামঞ্জস্য খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজেদের প্রাচীনতার পরিবর্ত্তন ঘটেছে কিন্তু গৃহও কি একই ছন্দে বদ্‌লে গেছে? এই প্রশ্নই তাদের মনে জাগে। চীনের প্রবাসী-ছাত্ররা দৃঢ়-বিশ্বাস আর অক্ষুণ্ণ আশা নিয়ে দেশে ফির্‌লেও দেশকে এই কারণেই সূক্ষ্ম-দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছে। Hu Suh লিখেছেন—

"যখন আমেরিকা ছেড়ে দেশে ফেরবার আয়োজন করছি, আমার দু একজন চীনাবন্ধু বল্‌লেন—Mr. Hu, সাত বছরেরও বেশী হ'ল আপ্‌নি দেশ ছেড়ে এসেছেন, এই সাত বছরের মধ্যেই তিনটে বিপ্লব ঘটে গেছে।......এখন দেশে ফিরে বোধ হয় সেই ৭ বছর আগের পুরাতন চীনকে চিন্‌তেই পার্‌বেন্‌না।" আমি তার উত্তরে হেসে বলেছিলুম—এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার আবশ্যক নেই। দেশ আমার তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তনে অক্ষম, কারণ তা' না হলে তার প্রবাসী সন্তানরা দেশে ফিরে তাকে চিন্‌তেই পারবেনা, তাই সে যখন দু'পা দ্রুত চলে যায়, তৎক্ষণাৎ দু'পা পেছিয়ে আসে। আর এখন তার পিছু হাঁটবার সময়, তার সেই চিরকালের পুরাতন মুখখানিও দেখ্‌বার সুযোগ আমার হ'বে।

"কথাটা নেহাৎ ঠাট্টার নয়, একদম্‌ সত্য। গৃহাভিমুখী ছাত্রদের তাই আমি আশার সঞ্চয়ের পরিমাণ একটু কমিয়েই নিতে বলি, কারণ যদি হতাশ হতে হয়, আঘাতটা বেশী করেই

লাগ্‌বে। জাপানে যখন জাহাজ এসে পৌঁছাল—শুনলেম্ Chang Hua রাজতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা কর্‌ছে। আর এখন আমি ৪ মাস ঘরে এসে বসেছি; যা দেখছি, শুনছি সবের সঙ্গেই আমার আশা ঠিক্ মিলে গেছে। ৭ বছর আগের চীনের সেই পুরাতনীকেই আমি দেখ্‌ছি! দু ঘণ্টা কোনও থিয়েটারে কাটিয়ে এক বন্ধুকে বল্‌লুম, নাট্যশালার নামটী নতুন, অবয়বটীও নব্য......কিন্তু নাটকটী সেই চির-পুরাতন, পৌরাণিক বল্‌লেও চলে!.........আমার এত কথার লেখার মধ্যে হয়ত দুঃখবাদের ছায়াই পড়েছে, কিন্তু আমি দুঃখবাদী নই। গত বিশ বছরের মধ্যে চীন অনেক' খানি এগিয়ে গেছে সত্য কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আজও বড় অলস, বিষম অব্যবস্থিত-চিত্ত।"

বিজ্ঞানে কোনও আবিষ্কার হ'লে, পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাকে সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে রাজী হয় না। কেউ এমনও থাকেন যে, নব-আবিষ্কারকে অমান্য করাই তাঁর ধর্ম্ম হয়ে ওঠে—পৃথিবীশুদ্ধ লোক তা'কে মান্য করলেও। চিরপ্রচলিত বিধিকে ডিগ্‌বাজী খাইয়ে—Yung Wing ১২০ জন তরুণকে কালাপানির পার নিয়ে গেছলেন। রোষানল জ্বলে উঠতে Yun Wing ব্যতীত সবাই ফির্‌লো বটে, কিন্তু রোষানল নিভ্‌লো না। প্রত্যাগত তরুণ-ছাত্ররা সতর্ক সিপায়ের পাহারায় বন্দী হয়ে রইলো। ১৮৯৯ সালে তাদের ১৩ জনের ফাঁসী হ'ল। এই হতভাগ্যদের মধ্যে Yung Wing'র এক ভ্রাতুষ্পুত্রও ছিল; তাঁর আর একজন

ভাইপো, জেলের দোতালা থেকে লাফিয়ে জাহাজে করে পালিয়ে যায়, ধরা তা'কে পড়্‌তেই হ'ল। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দী হয়ে রইলো। এই যে জীবন নিয়ে ছেলেখেলা হয়ে গেল এর মূলে কি কিছু নেই? এর মূলে সেই চিরন্তন সমস্যা, নতুনকে বরণ করায় পুরাতন-প্রিয় রক্ষণশীলের শত্রুতা। হাত-মাপা-দড়ি দিয়ে নিজেকে খুঁটীর সঙ্গে বেঁধে বিচরণ করাই যার স্বভাব, স্বাধীন অবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে কাউকে খেলা করতে দেখলে সে ক্রোধ আর ঈর্ষায় জ্বলে উঠ্‌বেই। তা'র মাপা গণ্ডীর মধ্যে হত-ভাগ্য এসে পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই। অত্যাচারী পশুশক্তি তার জীবনের আনন্দকে পিষে দেবেই। বিদেশযাত্রী প্রথম-চীনাছাত্রদের এই অবস্থাই হয়েছিল। সারা চীন রক্ষণশীল, রাষ্ট্রশক্তিও তাই; যৌবন-অভিযাত্রীদের সঙ্গে পদে পদে বিরোধ বাধ্‌লো। বিরোধিতা বিপ্লবীদের আরও উত্তেজিত করে দিলে। রুষ-জাপান যুদ্ধের পর প্রত্যাগত ছাত্র আর গবর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ গভীর হয়েই বাধ্‌লো। দেশে রাষ্ট্রের এ দুর্গতি দেখে প্রবাসী চীনাছাত্ররা অসন্তুষ্ট হ'ল'। ভবিষ্যতকে অমানুষিক অত্যাচারে অন্ধকার দেখে তারা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাত্রদের মধ্যে গুপ্ত বৈপ্লবিক-সমিতি গড়ে উঠলো—দেশ বিদেশ দু'জায়গায়। বিপ্লব সমিতির নেতা Sun Yatsen লিখেছেন, "আমার বিপ্লবান্দোলন সাধারণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের দাবীদাওয়া, সুখশান্তি অক্ষুণ্ণ

রাখাই এ'র উদ্দেশ্য। চীন-জাপান যুদ্ধের পর আমি আমেরিকা এবং অন্যান্য জায়গায় ঘুরে বেড়াই।......১৯০৫ সালে ইউরোপে ফিরে দেখলুম্ যে, সব দেশে চীনাছাত্রদের অধিকাংশই আমাদের বিপ্লব আন্দোলনে সমর্থন করলে। জাপানে এসে দেখলুম—সবপ্রদেশের সবশ্রেণীর চীনাছাত্ররা এই আন্দোলনে যোগ দিলে। ১৯১১ সালের বিপ্লবে আমাদের অনেক সভ্য জীবন দেন।"

এই বিপ্লবানলে যাঁরা জীবনাহুতি দিয়াছেন তাঁরা সবাই ছাত্র। জীবনদানের জন্য সে সময়ে আমেরিকা, ইউরোপের অনেক প্রবাসী ছাত্র দেশে ফিরে এলো। জাপান-প্রবাসী চীনাছাত্রের একটীও অবশিষ্ট ছিল না। স্বাধীনতাযজ্ঞে জীবন বলি দেবার তখন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।

এই বিপ্লবান্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করে জনসাধারণের অকৃত্রিম স্বাধীনতার ওপর বিরাট গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। চীনের এই বিরুদ্ধঅভিযান পুরোমাত্রায় রাজনৈতিক ছিল। বিদেশে গিয়ে নিজের অবস্থার সঙ্গে বিদেশী জাতির তুলনা করে বুকে ব্যাথার পাহাড় জমা হলো। স্বদেশের নিকৃষ্টতা উপহাসের মত দিন দিন পূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রকট হয়ে উঠলো। প্রথমে এলো—সঙ্কোচ, তারপর এলো ক্ষোভ। ক্ষোভের মাত্রা বেড়ে গিয়ে আঘাত করার স্পৃহাকে জাগিয়ে তুললে। বিপ্লবে হ'ল তা'র পরিণতি। যৌবন-অভিযান সুরু হ'ল রাজনীতির বড়রাস্তায়, কিন্তু অনেক খানি অগ্রসর হবার পর সে আরও বিস্তৃত

রাজপথে গিয়ে পড়লো। এ পথ—নব-সভ্যতা সন্ধানের পথ। যে বহুকাল হতে গায়ে ধুলোকাদামেখে দেহকে কুশ্রী করে ফেলেছে আজ তা'র গায়ের চামড়াটা পরিষ্কার করলেই যথেষ্ট হবে না; তার অন্তরকেও পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করতে হবে; কারণ—মলিনতা তার চামড়ার ওপরেই নয়, তার অন্তরের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত। এই ছিল মুক্তিকামী, কর্ম্মী, চীনা তরুণদের ধারণা। নিরলস কর্ম্ম-জীবনে অবিশ্রান্ত ভাবে খেটে তারা এই সত্য উপলব্ধি করলে যে, মানব চক্ষে নিজেকে কুশ্রী করবার স্পৃহা যে জাতের এত গভীর, রাজনৈতিক সমস্যাই তার পক্ষে চরম নয়; তার শ্রেষ্ঠ বা প্রধান সমস্যা সভ্যতা-মূলক। চীনের আন্তরিক জীবনের উন্নতি কল্পনায় তারা তখন আত্ম-নিয়োগ করলে। তারা তখন নব-শাসনতন্ত্রের উপাসক নয়, নব-সভ্যতার পূজারী। আত্ম-ত্যাগী কর্ম্মীদের এরূপ পথ-পরিবর্ত্তনের পরিচয় চীনের সাহিত্য বিপ্লবের নেতা Dr. Tsai Yuanpei'র জীবনেই পাওয়া যায়।

"Dr. Tsai, দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। ১৮৬৭ সালের ১১ই জানুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন কন্‌ফুসিয়ান্ মতাবলম্বী ছিলেন। চীন-জাপান যুদ্ধের আগে, ২৬ বছর বয়সে—তিনি চীন-সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই যুদ্ধের পর প্রবীন চীনা-পণ্ডিতরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সমাদর করতে, Dr. Tsai অনুদিত পাশ্চাত্য-পুস্তকাবলী পাঠ করতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের Reform Movementএও

তিনি যোগ দেন। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ নির্দ্দেশ করে তিনি বলেন, "আমাদের মতাবলম্বী বেশী লোক নাই। এই মুষ্টিমেয় লোক অতবড় রক্ষণশীল শক্তিকে জয় কর্‌বে কী করে? Peking গবর্ণমেণ্টের ওপর সব আস্থা হারিয়েছি। শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে আমি জীবন উৎসর্গ কর্‌লুম।"

Dr. Tsai ভীষণ বিপ্লবী হয়ে উঠলেন। যে সব বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা কর্‌তেন, সেখানে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়তই সংঘর্ষ হ'তো, তাঁর মানুষের দাবী, আর স্বাধীন চিন্তার প্রচার করা নিয়ে। সাংহায়ে তিনি এক স্বদেশী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন; আর ঝল্‌ঝলে পায় জামা ত্যাগ করে যুদ্ধের ড্রিল্ কর্‌তে লেগে যান, পূর্ণোৎসাহে। এই সময় বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে "Alarm Bell" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাতে রাশিয়া আর ফ্রান্সের বিপ্লব-সম্পর্কিত পুস্তক সমূহের অনুবাদ থাকতো। বিদেশে গিয়ে শিক্ষালাভের আকাঙ্খা তাঁর প্রবল হয়ে উঠলো। ১৯০৭ সালে তিনি Berlinএ চলে গেলেন।

১৯১১ সালে, চীনে বিপ্লবের আগুন যখন জ্বলে উঠলো, তখন তিনি জার্ম্মানীতে। নব-প্রজাতন্ত্রের প্রথম শিক্ষাসচিব হ'বার জন্য তিনি দেশে আহুত হলেন। কিন্তু বেশী দিন তিনি টিকে থাক্‌তে পার্‌লেন না। নষ্ট-কর্ম্মচারীদের সংস্পর্শে এসে তাঁ'র উৎসাহ নিভে গেল। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি ফ্রান্সে চলে গেলেন। কিছুদিন পরে Peking'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

Chancellor হ'বার জন্য পুনঃ আহূত হ'লে, তিনি জবাব দেন "রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘুচিয়েছি। এখন শিক্ষা নিয়ে আমি পড়ে থাকবো,—সারাজীবন।"

কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর উক্তির কোনও ব্যতিক্রম হ'ল না। Peking'র জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়কে তিনি অচিন্ত্যপূর্ব্ব জীবন দান করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি আমূল পরিবর্ত্তিত কর্‌লেন। নব-জীবনের আনন্দে ছাত্রেরা অনুপ্রাণিত হ'ল; তাদের মন্ত্র হ'ল অবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা। এ ঘটনা চীনে অভূতপূর্ব্ব। চীনের নব-সভ্যতার কেন্দ্র হ'ল এই বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ব্ব, পশ্চিমের বিপরীত সভ্যতা সমন্বয়ে—এ হ'ল পীঠস্থান, দুটী জগতের অপূর্ব্বসঙ্গমস্থল, নিখিল মানবের প্রয়াগ।

Dr. Tsai নিজের জীবনে যা' উপলব্ধি করেছিলেন, বিদেশ প্রত্যাগত আরও অনেক ছাত্রই তা' করেছিল। শাসন তন্ত্রের পরিবর্ত্তন করে চীনকে নব-জীবন দান করাই তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল; পরে, এই উন্নত জীবনের পরিকল্পনা মূলের দিকে নির্দ্দিষ্ট হ'ল; দৃষ্টি তখন তাঁদের আরও গভীর, আরও সূক্ষ্ম।

তিন

দেশমার গুরু,-ব্যথা কে ঘুচাল ?
তরুণ সে।
অমা-নিশীথের, কালিমা মুছাল
অরুণ রে।

খোলে প্রাণদানি, ভাগ্যপুরের
বন্ধদ্বার
পাকা-সোণা হ'ল, দূর অদূরের
অন্ধকার॥

বৈচিত্রহীন অলস জীবনের সজীবতার পরিমান করা যায় না, তখন জীবনকে একটা ভাঁঠাপড়া প্রাণহীন প্রবাহ বলেই মনে হয়, যেন তার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত কিছুই নেই ; এমন কি তার অস্তিত্বই তখন সংশয়ের বস্তু। কিন্তু যে তার ভূতপূর্ব্ব ভবিষ্যতের প্রতি মূহূর্ত্তগুলি বর্ত্তমানে আশ্চর্য্য ভাবে সফল করে নিল, নিজ পরিপূর্ণ জীবনের যাদুস্পর্শে, তার পরিবর্ত্তন বিমুগ্ধ দর্শকের বিহ্বল দৃষ্টির সাম্‌নে বিস্ময়বেষ্টিত প্রহেলিকার মতই একদিন ফুটে ওঠে। দর্শক তখন ভাবে, ও এত প্রাণবন্ত হল কী করে? জাগ্রত চীনের জোয়ারমত্ত জীবনের পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ ধারা এই কারণেই অনেকের নিকট আকস্মিক ঘটনা। যৌবন অভিযানের পথে চীন আশ্চর্য্য ভাবে বদ্‌লে গেল। ১৯২১ সালে Tientsinএ স্বনামখ্যাত বক্তা, Dr. Timothy T. Lew কোনও বক্তৃতায় বলেন,—

চীনের যৌবন অভিযান

"১৯২১ সালের এপ্রিলে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরলুম। সে সময় একপক্ষকাল সাংহাইয়ে কাটাই। প্রায় দশবৎসর বিদেশ-বাসের পর, ঘরেফেরা সবারই মত আমিও সমাজের পরিবর্ত্তন দেখবার জন্য উৎসুক ছিলুম। অচিরেই কোনও অদৃশ্য শক্তি আর আবহাওয়া আমায় যেন হতভম্ব করে দিলে। অনুভব করলুম, যেন এক নতুন জীবন এখানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে, ক'বছর আগে যার আভাষও পাইনি। লোকদের চেহারা, তাদের কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার, অভিব্যক্তি, বিভিন্ন-আধুনিক প্রশ্ন সম্বন্ধে মতামত, সংবাদপত্র প্রকাশিত জনমত, আলোচ্য বিষয়,—সমস্তই নব-জীবনের পরিচয় দিচ্ছে। একদিন সন্ধ্যায় রাস্তায় বেরিয়ে শুধু বই আর সংবাদ পত্রের দোকানে ঘুরে প্রায় সাতচল্লিশ রকমের সাপ্তাহিক মাসিক, অর্দ্ধ বার্ষিক পত্রিকা সংগ্রহ করলুম। সারা রাত তাদের পাতার মধ্যে কাটিয়ে বুঝলুম যে, আমেরিকার এইরূপ ৪৭টি বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে যা অলোচনা আছে, তার চেয়েও আধুনিক আলোচনার এবং উদার মতের সন্ধান এদের মধ্যে মেলে।...... তারপরে নানান্ জায়গা ঘুরে, বিভিন্ন-শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বক্তৃতা করে আর ৪।৫টা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে,—এই নব-জীবনের প্রতি উত্তরোত্তর মুগ্ধই হয়েছি, সে মোহ কালের সঙ্গে বেড়েই চলেছে।"

চীনের জাতীয় জীবনে তখন জাগরণের সাড়া; অচঞ্চল ফল্গু-প্রবাহ নির্ঝরিণীর চঞ্চল-নৃত্যে উচ্ছ্বসিত। মুগ্ধ হবারই কথা।

স্বরস্বতীর কমলবনে যারা অমৃত সঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিল তারা তখন বিপ্লবী। এই "ছাত্র বিপ্লব," সারা চীনব্যাপী বিরাট আন্দোলনের একটি অভিব্যক্তি মাত্র। সাধারণের মাপকাটিতে যে জ্ঞানী বলে পরিজ্ঞাত, সেও জ্ঞাননবীশের হাত ধরে যৌবন অভিযানের পথে এসে নাম্‌লো। এদের অধিকাংশরই বয়স—১৭ হতে ২৫শের মধ্যে। এইসব ছাত্ররা কী পরিমানে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার বর্ণণা সহজ সাধ্য নয়; দৃষ্টান্ত দিয়েই তার আকার ও মনের পরিচয় সুপরিস্ফুট করা যাক্। কলমের খোঁচায় কিম্বা তুলিরটানে এর রূপবর্ণণা অসম্ভব; এর প্রতিধ্বনি সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল।

"১৯১৯ সালের ৪ঠা মে'র প্রভাত, Peking'র তেত্রিশটী স্কুল কলেজের ১৫,০০০ ছাত্র, ছাত্রী Shantung বিচারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে Demonstration করে ঘুরতে লাগলো। বিদেশী রাজদূতের গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ কর্‌তে গিয়ে তারা পুলিশের বাধা পেলে। অনিবার্য্য সংঘর্ষের ফলে তেত্রিশ জন বন্দী হ'ল। তাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ স্বরূপ Peking'র এই সব ছাত্ররা স্কুল-কলেজ যাওয়া বন্ধ কর্‌লে। কর্ত্তাদের কাছে জানালে যে ঐ তেত্রিশজন ছাত্রকে মুক্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত তারা আর বিদ্যালয়ের চৌকাট মাড়াচ্ছেনা। ৭ই মে, বন্দী শিক্ষার্থীর দল মুক্ত হ'ল। সহপাঠীদের কাছে তারা পেলে বীরের সম্মান আর "স্বাগতঃ" আহ্বান। হর্ষ,

অশ্রুর অকৃত্রিম আতিশয্যে সেদিন সার্থক হয়ে গেল। সেদিনের সম্মান চির-অক্ষুণ্ণ রাখবার কল্পনায় সারা চীন জুড়ে একে একে ছাত্র-সংঘের প্রতিষ্ঠা হ'ল।"..

বাপ, মা, ছেলে মেয়েকে শিক্ষালয়ে পাঠালেন লেখাপড়া শিখতে ; সেখানে ছাত্র-জীবনে তাদের বিপর্য্যয় ঘটে গেল, জাতীয়-জীবনের মূলসমস্যার দুয়ারে এসে তখন তারা ঘা মারছে। Demonstration'র ডাণ্ডা দিয়ে একগুঁয়ে কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদ্রেক করতে তারা তখন ব্যস্ত। এই সময়ের ঠিক তিন দিন আগে Prof. John Dewey চীনে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি লিখেছেন,—

"বাইরে থেকে রাজনৈতিক মনে হলেও, এ আন্দোলন রাজনীতিমূলক নয়। এ যেন এক নব-চৈতন্যের বিকাশ। শিক্ষা এদের মধ্যে নতুন বিশ্বাস, নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছে। তাই এ নব-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যুবক যুবতীর এক মানসিক জাগরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।"

সাধারণতঃ কোমল-স্বভাবা বলে নারী পুরুষের মত বিপ্লব দুর্য্যোগের প্রথম মুহূর্ত্তেই বাইরে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হয় না। কিন্তু চীনে এ'র ব্যতিক্রম হয়েছিল। স্ত্রী, পুরুষের সমন্বয়ে জার্ম্মাণীর যৌবন-অভিযান যেমন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, তেমনি চীনেও তরুণ বিপ্লবী-ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়াল তরুণী ছাত্রী। এইখানে বোধহয় ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের আকাশ পাতাল ব্যবধান। বোধহয়, ভারতের কোন আন্দোলনই নারীর

সহভাগিতায় সুন্দর হয় নি। এই বিপ্লবের কারণ একটা নয়, —অসংখ্য। ঘর যখন জীর্ণ হয়ে যায়, ছিদ্র তখন তার একটা নয়, অগণিত। সেই জীর্ণ-ঘরের সংস্কার কার্য্য যখন সুরু হয় তখন তার চাল থেকে আরম্ভ করে মেঝে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা রাখে; একাধিক দীনতার দরুণ সে স্বীয় দৈহিক বিপ্লবে অমত করে না। চীনেও তাই নানান্ অবস্থার এক অদ্ভুদ সমন্বয়ের মধ্যে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। পুরাতন যুগের গতানুগতিক পথে আর আকর্ষণ নেই, সে পথের প্রত্যেক ধুলিকণাপর্য্যন্ত প্রাচীন, জীর্ণ! যে, জীবনের আনন্দে পথে নেমেছে তা'রপক্ষে ও পথ নির্ব্বাচন করা অস্বাভাবিক; সে চল্‌লো নতুনপথে, কারণ সে নতুন যুগের মানুষ। নবীনত্বের পূজারী তরুণচীন অভিনব পথসৃষ্টি করে চল্‌লো। কোনও ছাত্র লিখেছিল, "আমরা বর্ত্তমানের মানুষ, এই কথাটিই আমাদের স্মরণ রাখ্‌তে হবে। অতীতের মানুষ অতীতেই ছিল। তাঁদের প্রাচীন-লিপি, সভ্যতা এবং সবই বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে, সে সব কতদূর আমাদের প্রয়োজনের অনুকূলে তা' দেখ্‌তে আমরা রাজি; কিন্তু তাই বলে সে সব গ্রহণ কর্‌তে রাজি নই।"

আর একজন লিখ্‌লে, "সকল অনিষ্টের মূল হ'চ্চে সেই শক্তি, যা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র নষ্ট করে; সে শক্তি হচ্চে আমাদের এই সংসার, এই গৃহ।"...সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার অপরিসীমতায় তরুণ চীন প্রাচীনকে ধ্বংস করতে উন্মুখ। অনেকে প্রশ্ন করেন,

সৃষ্টি কর্‌তে গেলেই কি ধ্বংস কর্‌তে হয়? এ'র উত্তর—সত্যই তাই হয়। প্রকৃত কর্ম্ম জগতে এই কথাটাই মস্ত বড় প্রমাণিত সত্য; সৃষ্টি-শিল্পির কাছে এ'র বিজ্ঞপ্তির দরকার হয় না। এমনকি বিশ্ব-সৃষ্টির কাল্পনিক ব্যাখ্যার মধ্যেও, প্রলয় আর ধ্বংসের পর সৃষ্টির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তরুণ আন্দোলনের এক বিখ্যাত নেতা Pro. Chentu-seu, বলেন, "প্রকৃত প্রজাতন্ত্র পেতে হ'লে Confucianism, প্রাচীন ন্যায়-শাস্ত্র এবং শাসনতন্ত্রের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর উপায় নেই। প্রকৃত বিজ্ঞান জান্‌তে গেলে, ধর্ম্ম এবং প্রাচীন-শিক্ষাধারার সঙ্গে গর্‌মিল অবশ্যম্ভাবী; আর আমাদের যদি প্রজাতন্ত্র এবং বিজ্ঞান দুইই পেতে হয়, তা'হ'লে বহুকালের সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষ থেকে আমাদের অব্যাহতি অসম্ভব।"

নির্দ্দিষ্ট ধারায় কর্ম্ম-পদ্ধতি শৃঙ্খলিত করবার উদ্দেশ্যে এরা পুরাতনকে বিনা দ্বিধায় সিংহাসন ছেড়ে দিতে রাজি হয় নি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে তার যোগ্যতা নির্ণয় করেছে। Hu Shih এই মর্ম্মে লেখেন, "—এই আন্দোলনের মূলগতি, এক নব-অভিমতের চরম পথে।......(১) আবহমান কালের রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন কর্‌তে হ'বে—বর্ত্তমান সময়ে তাদের কোনও মূল্য আছে কিনা?.. ...(২) সাধু ব্যক্তিদের পরম্পরাগত শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন কর্‌তে হ'বে,—সে শিক্ষা অধুনা আমাদের পক্ষে উপযোগী কি না?...(৩) প্রথাজনিত বিশ্বাস ও কর্ম্মধারা

সম্বন্ধে প্রশ্ন কর্‌তে হ'বে—বহুদ্বারা গৃহীত বলেই তাদের সত্যরূপে মেনে নিতে হ'বে কেন?—বহুকে অনুকরণ করাই কি অমাদের উদ্দেশ্য? পুরাতন ছাড়া আর কোনও উৎকৃষ্টতর যুক্তিযুক্ত উপকারী পন্থার সন্ধান কি মেলে না?"—

জীবনকে নুতন করে গড়্‌তে গিয়ে পুরাতনের অন্ধ-সংস্কারকে এরা নির্দ্দয়ভাবে ভেঙ্গেচুরে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। বৈজ্ঞানিকের সুক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে এরা প্রাচীন-রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিলে। তাদের যৌবন অভিযানের পথে সে সবের প্রতিকূলতা প্রমানিত হবার সঙ্গে সঙ্গে—তা' পরিত্যজ্য হ'ল। সেই মুহূর্ত্ত হতেই—নব্য এবং প্রাচীন চীনের পরস্পর বিচ্ছেদ-পর্ব্বের সূচনা। এই কারণেই তরুণ-চীনের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তীত হ'ল। আগেকার চীন, নাবালকদের কানে মহামন্ত্র আওড়াতেন, "গুরুজনদের অনুসরণ কর; অতীতকে শ্রদ্ধা কর।" সে স্থলে আজ তরুণচীনের মন্ত্র হচ্চে,—"নিজেকে প্রকাশ কর।' বৈচিত্রহীন প্রাচ্য জীবনে এ যেন অভিনব-প্রেমের অবতারণা। ক্ষুদ্রের আবহমানকালের ক্ষুদ্রত্ব আজ যেন বিরাটের মধ্যেই আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। তাকে অস্বীকার করা আর সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যকে অস্বীকার করা একই কথা। নব্য-চীনের এই অপূর্ব্ব মন্ত্র ফাঁকা কথার ভোজবাজী নয়; শুধু বাগাড়ম্বর নয়। এরই মধ্যে তরুণের সত্য-সন্ধানের প্রচেষ্টা অন্তর্নিহিত। নতুন ছন্দে স্বীয় জীবন-কাব্য রচনা করবার গভীর আকাঙ্ক্ষা এদের চরিত্রগত-বৈশিষ্টের মধ্যেও প্রকট

হয়ে উঠলো। Prof. Dewey বলেছেন,—"যে সব বিষয় কোনও American Schoolএ শুধু বিরক্তির চাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি করে, সেই সব বিষয়ের বক্তৃতা, চীনের উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ধীর মনোযোগ সহকারে শোনে। পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের চেয়ে এদেশের জ্ঞান-তৃষ্ণা ঢের বেশী প্রচণ্ড।"

তরুণ বল্‌তে, শিক্ষিত জগতে ছাত্রদেরই বোঝায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এই ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলনের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল এই মাত্র সেদিন। চীনে কিন্তু জাতীয় জাগরণের দিনে তরুণ সম্প্রদায়ই অগ্রদূতের কাজ করেছে। কর্ম্মে, সাহিত্যে, সর্ব্বত্রই তাদের জাগরণ অভিব্যক্ত। "আজকালকার যে কোনও পত্রিকা খুললেই চোখে পড়ে—এক অপূর্ব্ব আগ্রহের ছবি; যে আগ্রহ ইতিপূর্ব্বে কখনও অনুভূত হয়নি। প্রথমতঃ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ঝোঁক তরুণদের খুব বেশী। আর সমস্যার ত' একটা সমুদ্রই তারা সৃষ্টি করেছে, Cofucianism থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য, জাতীয়তা, নারীত্ব, এমন কি পিতাপুত্রের সম্পর্ক পর্য্যন্ত! Ibsen, প্রজাতন্ত্র এই সবই তাদের আলোচ্য বিষয় আজকাল।"

চীনের এই তরুণ আন্দোলনের বীজ বপনের কার্য্য হতে সুরু করে,—ফসল ফলানো,—মারাই বাঁধা পর্য্যন্ত যাঁরা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে এসেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে দু'এক কথা না বললে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এঁদের মধ্যে—Yen Fuhকেই অগ্রণী বলা যেতে পারে। ইনি ইংরাজী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করে

অনুবাদকার্য্যে ব্যাপৃত হ'ন। রাজনীতির বড় বড় মনীষীদের রচনা তিনি দেশবাসীর আয়ত্তাধীন করেছেন। Stuart Mill থেকে আরম্ভ করে Darwin, Spencer, Rousseau প্রভৃতি সকলেরই রচনার অনুবাদ তিনি করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের সংস্কারকদের মধ্যে Liang Chi-chao একজন। তিনি রাষ্ট্রশক্তির কু-নজরে পড়ে জাপানে পালাতে বাধ্য হন।

Peking'র সরকারী বিদ্যালয়ের ইদানীন্তন Chanceller, TsaiYuanpei জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্সের এক কৃতী ছাত্র ছিলেন। শিক্ষার-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চীনে যে নব সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছিল তার রচনার গৌরব এঁরই প্রাপ্য। সঙ্কীর্ণ শিক্ষাপ্রণালীকে তিনিই উদার করে তোলেন। ১৯১১সালের বিপ্লবের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলে, শিক্ষা-সচিবের পদে তাঁকে বরণ করা হয়। ১৯১৭ সালে তিনি জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের Chanceller হ'ন।

আর এক মহাত্মা চীনের এই তরুণ আন্দোলনের পথ-প্রবর্ত্তক-স্বরূপ ছিলেন। তাঁর নাম Chen Tu-seu। Peking'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষে "চরমপন্থী" মনে হওয়ায়,—তাঁকে দুবার কারা বরণ করতে হয়েছিল। সমাজ-বিপ্লব, প্রজা-তন্ত্র এবং বিজ্ঞানের স্বার্থসন্ধানে তাঁকে প্রচলিত সব অনুষ্ঠানকেই নির্ভীকভাবে আক্রমণ করতে হয়েছিল।

এই Chen Tuseu'র সঙ্গে—Dr. Hu shihর পারিবারিক সম্পর্ক আছে। Dr. Hu আমেরিকায় শিক্ষা সমাপন করে আসেন। তাঁ'কে চীনের "সাহিত্য-বিপ্লবের" (পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে সাহিত্য-বিপ্লব আলোচিত হয়েছে) গুরু বললেও অত্যুক্তি হয় না। চীনের সাহিত্য-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর দু'একটি ইঙ্গিত classic হয়ে গেছে।

এই ত' গেল প্রবীণ বিপ্লবী নেতাদের পরিচয়। এই আন্দোলনে বহু ছাত্রও নেতৃত্ব করেছেন। তাঁদের মধ্যে Fu Sin Nien, Lo Cha Lan, Chiang Shas Ynan, ও Wang Kuang Chiই প্রধান। কর্ম্ম-অধ্যক্ষতায় এবং বিপ্লব পরিচালনায় এরাও কোনও অংশে ন্যূন্ ছিলেন না।

চীনের প্রবুদ্ধ তরুণ, অভিযানের পথে বিভিন্ন সংঘ সৃষ্টি করেছে। Pro. John Dewey, Mr. Bertrand Russel, Dr. H. Dreiseh, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বহু মনীষী বক্তৃতা দিবার জন্য, এরূপ একটী সংঘ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন্। জীবনকে অখণ্ডভাবে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে এরা অসাধ্য সাধন করেছে! চীনের চিন্তার ও জীবনের ধারাকে আমূল বদ্‌লে দিয়ে তরুণ সম্প্রদায় জয়-যাত্রায় চলেছে।

—চার—

যুক্তি তেমন শক্ত হয়নি,
বুদ্ধি হয়ত শুদ্ধ নয়।
কিন্তু জানে সে, বোমা, বন্দুক,
কামান শব্দে যুদ্ধ হয়॥

জানে মিল্‌বেনা বাসর-শয্যা,
কনে-চন্দন, গরদ-যোড়।
প্রাণটাকে যারা ফুঁদিয়ে ওড়াল'
তাদেরি তরে তো দরদ ও'র॥

অজ্ঞ মানুষ নিছক্‌ দৈহিক অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছু মান্‌তে পারে না, কারণ অন্য কিছু তার ধারণাতেই আসে না। কিন্তু যদি কোন উপায়ে এই অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করা যায় তখনই দেহের অতীতে যে মানুষ আছে, তার সন্ধান মেলে, তখনই বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, সূক্ষ্মদর্শী মানুষটীর প্রকাশ হয়। এই অজ্ঞতা দূরীকরণের প্রকৃষ্ট উপায়,—শিক্ষার সাহায্যে নৈতিক উন্নতি সাধন করা। চীনের জাতীয় অবস্থার অধোগতির ইতিহাস দু'একজনেরই হয়ত' জানা ছিল, কিন্তু শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অবস্থা-পর্য্যালোচনারও বিস্তৃতি হ'ল'; শত সহস্রের জ্ঞানচক্ষু আলোকের জয়গান গেয়ে উঠলো। ১৯০৫সালে সারা চীনের আধুনিক স্কুলগুলিতে ছাত্র সংখ্যা ছিল এক লক্ষ, ১৯১১ সালে সে সংখ্যা বেড়ে হল দুলক্ষ আর ১৯২২সালের মধ্যে তা—ছ'লক্ষরও বেশী হয়ে গেল। তারপর আবার হাজার হাজার

প্রবাসী চীনা ছাত্র দেশে ফিরে এসে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হল; ১৯১১সালের বিপ্লবের ইন্ধন এরাই জুগিয়েছে। এই বিপ্লবের সময় একদল তরুণ চীনাছাত্র বিদেশে ছিল। একজন পণ্ডিত তাদের সম্বন্ধে বলেছেন,—"নতুন প্রণালীতে শিক্ষা পেয়ে এসব তরুণদের চোখ্ খুলে গেছে, যেন কোন্ জাতুকরের সোনার কাটির স্পর্শ এরা পেয়েছে! সব রকম আন্দোলনে এরা যোগ দিয়েছে। বিলাতীর ওপর শ্রদ্ধা এদের নেই। এমন কি মাঞ্চু শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনেও এরা পরান্মুখ নয়।" ১৯১১সালে Dr. Sun Yat Sen'র নেতৃত্বে বিপ্লবসূচনা হয়। নিচেয় কোনও সহরের বিপ্লব কর্ম্মের বর্ণণা দেওয়া হ'ল:—

"১৮ই অক্টোবর, ১৯১১।

আজ বিকালে Nantai'র বিভিন্ন শিক্ষালয়ের আড়াই শ' ছেলে ড্রিল্ কর্‌বার জন্য মাঠে জড় হয়েছিল। আজকাল আমরা গুলি, বন্দুক ব্যবহারে অভ্যস্ত হ'বার জন্য খুব চেষ্টা কর্চ্ছি। অন্যান্য সহরে বিপ্লব সুরু হয়ে গেছে। Mr. Pong (আমাদের এই দলের নেতা) নতুন রকম সেজে' এসে ছিলেন। তখন ৫টা বাজে, গা-ঢাকা ভাব অন্ধকার করে এসেছে, তিনি আমাদের একত্র হ'তে বল্‌লেন্। যে সব বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে তাদের সম্বন্ধে দু এক কথা বলে, জানালেন, যে আজ রাত্রেই Foochow তে আমাদের এক বিপ্লব শুরু করতে হ'বে! আমরা তখন সকলেই নীরব; দেশের দুরবস্থার কথা তিনি বলে যেতে লাগলেন,

শাসনতন্ত্র আমাদের কী রকম জঘন্য, বিজাতীয়ের শোষণনীতি কতখানি হেয়, এ সব হতে মুক্তি দেবার জন্য নবশক্তিসম্পন্ন শাসনতন্ত্রের কী পরিমাণ প্রয়োজন, ইত্যাদি। চেঁচিয়ে তিনি বল্‌লেন,—"যারা স্বদেশের সেবা কর্‌তে চাও, এগিয়ে দাঁড়াও!" সুপটু খেলোয়াড়,—আমাদের ক্লাসের সর্দ্দার—Mr Li প্রথমে দাঁড়াল এগিয়ে, তারপর আমরা সবাই তার অনুসরণ কর্‌লুম্।

দলের মধ্যে আমরা জনকতক ছেলেমানুষ ছিলুম্। আমাদের স্কুলে ফিরে যেতে বলা হ'ল; আর সাবধান করে দেওয়া হ'ল; —যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু না জানাই। রাত তিনটের সময় বিপ্লব আরম্ভ হবে একথা আমি শুনে ফেলেছিলুম। যারা এ কাজে যোগ দেবে, তাদের সবারই হাতে রিভল্‌ভার। রাতে আমার ঘুম হ'লনা। চাঁদিনী রাত। বয়স্ক ছেলেরা পোষাক পরে প্রস্তুত হয়েছে দেখ্‌লুম্। স্কুলের দলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য তারা নিঃশব্দে পাঁচিল টপ্‌কালে। সারারাত সহরের দিকে চেয়ে রয়েছি,—তিন্‌টে বাজে প্রায়। হঠাৎ দূরে একটা নীল আলো জ্বলে উঠলো আর সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ানক আওয়াজ! তারপর এলো বন্দুকের শব্দ! কামানের শব্দ! আকাশ রাঙা হয়ে গেল! চারদিকে শুধু দুম্‌দাম্ আওয়াজ! ঘরে ফিরে এসে দেখ্‌লুম্,—দাদা, আর তার বন্ধুরা সব চলে গেছে।

"১৯শে অক্টোবর, ১৯১১ সাল

"স্কুলে খবর এলো,—দুজন বন্ধু মারা গেছে, আর অনেকেরই

খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। 'Red Cross' নাম দিয়ে আমরা এক মৃত ও আহত-উদ্ধারের দল গড়্লুম্। সহর দিয়ে চলেছি। জান্তুম্—জাতীয়সৈন্য Yu Hill এ আস্তানা গেড়েছে। চারদিকে কামান দাগ্বার জন্যে সেই জায়গাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। সারা সকাল ধরে ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গেছে। পথে যেতে যেতে আমাদেরও দুএকটা ছোটখাট যুদ্ধ হয়ে গেল। Yu Hill এ পৌঁছে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম,—আমাদের অনেক 'পড়ো-বন্ধু' এদের মধ্যে! ধনীরা খাবার দিয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

বিকালে বাড়ী গিয়ে দেখি,—নানাজায়গায় পাঁচ-রঙা নিশান উড়্ছে, শুন্লুম্, এই সব পতাকা, Hua Nang-মেয়ে কলেজের ছাত্রীরা লুকিয়ে প্রস্তুত করেছে। বিপ্লবীরা সহর অধিকার করেছে! তবুও আমাদের সতর্কতার সহিত পাহারা দিতে হচ্ছিল,—সরকারী সৈন্য ইতঃস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

"১৯শে অক্টোবরের সন্ধ্যা; ১৯১১ সাল।

আমি এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেরুলুম। ছাত্র-সৈন্যদের দু-একটা ঘাঁটি দেখ্লুম। বিভিন্ন স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। পাহারার কাজে যাবার জন্য কেউ কেউ তৈরী হ'চ্চে। আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে,—তাদের কাজে আমরা যোগ দিতে পারি কিনা? তারা রাজী হ'ল। এক একটা ভারী বন্দুক নিলুম। আমার গায়ে ছিল এক লম্বা জামা। সে জামা পরে

পাহারা দেবার অনুমতি না পেয়ে, জামা বদ্‌লাতে ইস্কুলে ছুটলুম্‌। সেখানে গিয়ে দেখি দাদা রয়েছে। আমার নাবালকত্বের অজুহাতে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে দাদা নিজেই বেরিয়ে গেল।"

এইত' গেল একটী সহরের আশপাশ জুড়ে একটী বিপ্লবের কথা। ছাত্রচাঞ্চল্য কোনও সহর বা প্রদেশ বিশেষে আবদ্ধ ছিল না, সারা চীনজুড়ে—এই তরুণসম্প্রদায় বিপ্লব ঘোষণা কর্‌লে। উধাও-পথের ডাক এসেছে তখন, বাহির-মুখো-মন তাদের সাড়া না দিয়েই পারে না।

"আকাশে যখন দুর্য্যোগ, বাতাস তখন পথহারা, জলের ছাট্‌ তীরের মত তীক্ষ্ণ আর বজ্র তখন গর্জ্জন-ব্যস্ত; আকাশের তলায় এই মাটীতেও তেম্‌নি প্রলয়ের তাণ্ডবনৃত্য চলেছে। এ জাতের যৌবন-গরবীরা, চীনের অচিন্ত্যপূর্ব্ব গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকার্য্যে তাজা রক্ত দান করেছে।..... এস, আজ আম্‌রা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এ'র উৎসব করি। কিন্তু আজও উত্তরাঞ্চলে মাঞ্চুশক্তি বিরাজমান। ...এই কারণেই বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র হ'তে তরুণদের আহ্বান করেছি, তাদেরই দিয়ে গড়েছি বিপুল সেনাবাহিনী। উত্তরমুখে জয়-যাত্রা কর্‌বো বলে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই গৌরবমণ্ডিত মহাদেশটিকে শান্তিময় রাখবার জন্য মাঞ্চুবংশের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত কর্‌বো।-স্বদেশভক্ত তরুণ ভাইরা, আমাদের কার্য্যে যোগদান কর। 'পাঁচ-রঙা'—পতাকার তলায় আমরা সম্মিলীত হ'ব!"

বিপ্লব সফল হ'ল। শত সহস্রের জীবনপণ যার জন্য, তাও

মিল্‌লো। তরুণচীনের চোখে তখন আলো, বুকে আনন্দ, মনে সুখের একটানা প্রবাহ। স্বপ্ন তাদের সফল হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীত সকলেরই কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠ্‌লো।

"প্রাচীন প্রাচীর হাজার জাতি থেকে
চীন্ সে আগে বেরিয়ে এল একা,
দীর্ঘপথে সেইত' দিলে এঁকে
অগ্র-দূতের প্রথম পায়ের রেখা।
সেই অতীতের বাপ্‌ পিতাম'র দেশ,
আবার হলো নবীন মনোরম,
রাজ্যটী তার বদ্‌লে নিল বেশ,
উজল, তাজা ভোরের শিশির সম॥
রাম-ধনু রঙ, পাঁচ-রঙা-নিশান্
মিষ্টি হাওয়ায় উড়িয়ে দিল প্রাণ॥
এই চীনেরও গরব করার আছে—
লুপ্ত দিনের সভ্যতা বিস্ময়,
আজ্‌কে শুধু জগত জনার কাছে
শান্তি-বাণীর দিচ্ছি পরিচয়॥"

আগে চীনের রাজ-পতাকায় ছিল 'ড্রাগন্' আঁকা; তার স্থলে জাতীয়-পতাকা হল'—পাঁচ্‌টী রংঙে রাঙা; দয়া, ন্যায়, সাম্য জ্ঞান ও সত্য, এই পাঁচটি অপূর্ব্ব সম্পদের সমন্বিত প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু এই কষ্ট-অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যও চিরস্থায়ী হতে পারল না;

বিধিলিপি বোধহয় তখন প্রতিকূলতায় ব্যস্ত। প্রাচীন শাসন তন্ত্রের ধ্বংসের পর অরাজকতা এসে তাদের বিমর্ষ করে দিলে; তার ওপর আবার YuanShi Kai সম্রাটত্বের দাবী করে বস্‌লো। উত্তরাঞ্চলের সামরিক-শক্তি সম্পন্ন দস্যু-সর্দাররাও—নানা বিঘ্নের সৃষ্টি কর্‌লে; সারাদেশ জুড়ে অন্তর্বিপ্লব জ্বলে উঠ্‌লো! সুদীর্ঘ-অমানিশার পর, অরুণরাঙা-প্রভাতের উদয়-আভাষের সঙ্গে সঙ্গেই অশুভ কু-গ্রহের মত অসংখ্য কালোমেঘ আকাশ, বাতাস ছেয়ে ফেল্‌লে! ওদিকে আবার রণডঙ্কা বাজিয়ে এলো বিশ্বজোড়া মহাসময়!

এই নিদারুণ দুর্য্যোগের ফল্‌ও হ'ল বিষময়। বিপর্য্যস্ত জীবনের যাঁতাকলে পড়ে জনসাধারণ রাজনীতির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেল্‌লে; দৃষ্টি তাদের আরও গভীর হ'ল, আরও নিরাপদ, দৃঢ়মূল কোনও বস্তুর দিকে জীবনের সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়েও, তারাই যেন অমার্জ্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছে। এই যে তাদের কাম্য এলো জীবনের অল্পতা নিয়ে, এ'র জন্য দোষী যেন তারাই; শক্তি, শান্তির জীবন যে শাশ্বত হ'লনা, এও যেন তাদেরই দোষে? সবাই তখন দুঃখপ্রকাশে ব্যস্ত?—Huang Yuan-Yung তদানীন্তন, একজন নামজাদা রাজনৈতিক ছিলেন। ব্যর্থতায় ম্রিয়মান চীনা জনসাধারণের মর্ম্মোক্তি তাঁর লেখায় ফুটে উঠলো তিনি লিখলেন,—

"রাজনীতি আজ এমন গোলমেলে পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে,

তার সম্বন্ধে কিছু বলাই দুষ্কর। আমাদের আদর্শ কর্ম্মপদ্ধতির সমাধি হ'ল'; ভবিষ্যতের কর্ম্মীদের তা'কে আবার ভূগর্ভ হতে আবিষ্কার কর্‌তে হবে।.........আজ মনে হচ্চে যে, চীনের মুক্তির মূলের সন্ধান, নব-প্রবর্ত্তিত সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। এক কথায়, জগতের ভাবধারার সঙ্গে চীনের ভাবধারার মিলন চাই, তবেই এ জাত জাগবে।.........সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্তির জন্য ভাষাকে সরল, স্বচ্ছন্দ কর্‌তে হবে।"

১৯১১ সালের বিপ্লবে তরুণচীন জয়যুক্ত হলেও—চীনের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ চিরস্থায়ী হ'লনা। এ'র প্রধান কারণ, চীন বল্‌তে মুষ্টিমেয় তরুণ ছাত্র-ছাত্রীকেই বোঝায় না, নিরক্ষর, সরল, পরিবর্ত্তনভীরু অসংখ্য চীনাকেও বোঝায়; তাদের জীবন-প্রবাহে জাগরণের জোয়ার তখনো আসেনি। ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা স্থায়ী ইমারতের পক্ষে একান্ত দরকার। একটা জাতির জীবন গড়্‌তে গেলে তার মূলের শুশ্রূষা চাই। অভিজ্ঞ তরুণচীন এই কথাই তখন উপলব্ধি কর্‌লে, আর এই মর্ম্মেই কাজ কর্‌বার সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো। Chen Tuseu এই সময় Peking থেকে 'La Jeunesse (New youth) "নব-যৌবন" নামে এক মাসিক পত্র বার কর্‌লেন। তাতে তিনি প্রথম প্রবন্ধ যুবক-সম্প্রদায়কে আহ্বান করে লিখ্‌লেন,—

"পুরাণো একটা চীনা কথা আছে,—'তরুণ বয়সে প্রবীণ হবার চেষ্টা কর।' ইংরাজ, আমেরিকান্‌দের মত ঠিক উল্টো,—

বয়সে বুড়ো হলেও, মনকে তরুণ রাখবার চেষ্টা করো।' পূব, পশ্চিমের মানুষের মধ্যে এই একটী চমৎকার প্রভেদ নয়কি ?...

"আমাদের সমাজ উন্নতির পথে না অবনতির পথে চলেছে ? আসল কথা বল্‌তে আমার সাহস হয় না।...

"চোখের জলের মধ্যে আজ আমি এই কথা জানাতে চাই, যে আমার আশা, তোম্‌রা তরুণ মন নিয়ে—কর্ত্তব্যপথে অক্লান্ত-ভাবে চল্‌বে। যৌবনকে তোমরা সম্মান করবে, যৌবনের শক্তি আর কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সজাগ থাক্‌বে। তোম্‌রাই বা কেন লড়্‌বে ?—কারণ,—যা' জীর্ণ, যা যৌবন-হীন তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তোমাদেরই বুদ্ধি-ব্যয় কর্‌তে হ'বে। তারুণ্য-বর্জ্জিত সবকেই শত্রু এবং পশু বলেই ভাব্‌বে ; তাদের মোহে পড়োনা, তাদের সঙ্গ বর্জ্জন করো।

"ওগো, চীনের তরুণ ! আমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে কি ? প্রত্যেক দশজনের মধ্যে পাঁচজনকে দেখি তরুণ, কিন্তু মন তাদের বুড়ো হয়ে গেছে।......দেহের যখন এ অবস্থা তখন সে জীর্ণ হয়ে আসে। সমাজের যখন এ অবস্থা, তখন সে ধ্বংস-পথের যাত্রী। কালীর আঁচড়ে দুঃখপ্রকাশ কর্‌লে, এ রোগ নিরাময় হয় না ; যারা তরুণ এবং বীর তারাই একে নির্ম্মূল কর্‌তে পারে।...... বাঁচ্‌তে গেলে আমাদের চাই যৌবন, আত্মরক্ষা কর্‌তে গেলে চাই যৌবন। যৌবনই সমাজের আশাস্থল।"

এতবড় অকৃত্রিম, আন্তরিক ডাক্ শুধু কাণের পর্দ্দায় ঘা দিয়েই

নির্ব্বাণ লাভ করেনি, প্রকৃতই তরুণ চীনের মর্ম্মে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো। এতো বিলাসী যৌবনের স্তুতিবাক্য নয়; এ গৈরিক-প্রিয় সন্ন্যাসী-যৌবনের প্রশস্তি।

দেখ্তে দেখ্তে এই সাময়িকপত্র তরুণসম্প্রদায়ের মুখ্য-মুখপত্র হয়ে দাঁড়াল'। এরই অন্তরে একটী সম্পূর্ণ নতুন ভাব ভাষা পেয়েছে—তাই তরুণচীনের প্রশস্ত রাজপথে এ'র গতি স্বচ্ছন্দ ও সচল হয়ে উঠ্লো। Chen Tu-seu লিখ্লেন,—"আমরা যখন সাধারণতন্ত্রই চাই, তখন আর প্রাচীন-নীতিশাস্ত্রকে আশ্রয় করা মুর্খতা। আমাদের কাম্য হচ্চে স্বাধীনতা, সাম্য ও মুক্তি; পুরাতন নৈতিকতার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কই নেই।... পশ্চিমের ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কে এসে আমরা রাজনীতির দিক থেকে সচেতন হয়েছি—কিন্তু আমাদের শাসনতন্ত্র ত্রুটীতে পরিপূর্ণ—এ.কেবারে অচল।...আজ হতে আমাদের শ্রেষ্ঠ-সমস্যা হচ্চে,—নবসভ্যতার সাধনা।"—

কথায় এগিয়ে গিয়ে কাজে অদৃশ্য হয়ে থাকাটা বাঙালীর মজ্জাগত সংস্কার কিন্তু আমরা দৈনন্দিন সহর-জীবনে যাদের অপূর্ব্ব, আজব বলেই উপেক্ষা করে থাকি সেই চীনেদের কথা আর কাজ একই পর্দ্দায় বাঁধা একটা অপর থেকে স্বতন্ত্র বা বেসুরো থাকেনা। Chen Tu-seu তাঁর অল্পসংখ্যক তরুণবন্ধুকে নিয়ে চীনের 'মনুসংহিতা' 'কনফুসিয়ানিশ্ম্' এর প্রাচীন ভিত্তি দমিয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে লাগ্লেন। ওদিকে এক রক্ষণশীলের দল

তাকে সমর্থন করে হাঁকলেন "যুদ্ধং দেহি"। নীতিশাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধটা ভাল করেই বাধ্‌লো। Chen Tn seu বল্‌লেন—"যে ধর্ম্ম সমাজে পার্থক্যের সৃষ্টি ক'রে, সব মানুষকে সমান দেখে না, তাকে বাঁচতে দেওয়া পাপ। কন্‌ফুসিয়ানিস্‌ম্‌ ত' মরে গেছে—কারণ সে আধুনিক অভাবকে পূরণ কর্ত্তে পারেনি। সারা চীনের ধর্ম্মের সন্ধান নেবার অধিকার আজ হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার আঁচ যদি চীনের গায়ে না লাগ্‌তো, তাহ'লে এই পুরাতন ধর্ম্মের সমালোচনা করার কিছুই থাক্‌তো না; কিন্তু তা হয়নি, চীন আজ সাধারণ-তন্ত্রের সাধনা কর্চ্ছে, পৃথিবীর সভ্যতার পথের রেখা তাকেও মাড়িয়ে চলতে হ'বে।"

নূতন সুগম পথের সন্ধান দিতে গিয়ে, চিরকালের পায়ে-চলা-পথের ক্ষত বিক্ষত অক্ষম বুকে অবহেলার কাঁটা ছড়িয়ে দিলেই কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হয়না, সেই সব চিরপ্রাচীন পথের প্রতি বিঘ্ন, প্রতি অক্ষমতা, প্রতি ক্ষতের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং চিত্ত সচেতন করারও বিশেষ প্রয়োজন। তাই Chen Tu-seu যখন কন্‌ফুশিয়ানিস্‌ম্‌'এর বিরুদ্ধে লাগলেন,—তখন তিনি সেই অচল ধর্ম্মকে অমান্য করেই ক্ষান্ত হলেন্‌ না—তা'র ত্রুটি, বিচ্যুতিগুলি জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন। আধুনিক জীবনের সঙ্গে কন্‌ফুশিয়ানিস্‌ম্‌'এর সম্বন্ধ সম্পর্কে তিনি অসংখ্য যুক্তির অবতারণা করেন;—যেমন প্রথমতঃ,—'জনকজননীর প্রতি ভক্তি' এই

উপদেশের মধ্যে উপর্য্যুপরি ছুটো নৈতিক-আদর্শ আশ্রয় নিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, নারী—স্বামী, পিতা, শ্বশুর, এমনকি পুত্রেরও দাসীত্ব করে। তৃতীয়তঃ,—আধুনিক জগতে 'নারীজাতির সর্ব্ববিষয়ে মুক্তি' হচ্চে একটা প্রধান প্রশ্ন, কিন্তু কন্‌ফুসিয়ানিস্‌ম্ এ আন্দোলনের প্রচণ্ড-বিরোধী। বিধবাবিবাহের পথে পাহাড়ের মত বাধা হয়ে থাকা, পুরুষ হতে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা;—আর স্বাধীন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা—এইত' কন্‌ফুশিয়ানিস্‌ম্'র মূলমন্ত্র? হয় এই ধর্ম্মকে নির্ম্মূল করে দাও, না হয় কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন সম্রাটের চিরন্তন-অত্যাচার চীন নিঃশব্দে সহ্য করুক।

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রায় Chen, তরুণ সুধী ছাত্রদের সাহায্য পেলেন। এঁদের মধ্যে জাপান-প্রত্যাগত Wu Ni এবং আমেরিকা প্রত্যাগত Hu Sih ই প্রধান। এই Wu Ni, Chenকে চিঠিতে লেখেন,—

তখনকার সময়ে কন্‌ফুশিয়াস্ একজন মস্ত বড় লোক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকাল তাঁর গোঁড়া ভক্তরা তাঁরই মন্ত্র ও নীতিকে অস্ত্র করে নবচিন্তাধারার শিশুটীকে বধ করতে বসেছে। এটী খুবই স্বাভাবিক যে, আমরা এই অস্ত্রধারীদের আক্রমণ করবো। Liang Chichao যখন বলেন 'আমি কন্‌ফুসিয়াস্‌কে খুবই ভালবাসি, কিন্তু সত্যকে ভালবাসি তা'র চেয়ে'—তখন তিনি [illegible] কথাই বলেন।......এ সম্বন্ধে আমি

অনেক প্রবন্ধ লিখেছি কিন্তু সরকার তার অনেকগুলিই বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছেন।”—

এ’র উত্তরে Chen লিখলেন,—“তোমার মনীষা’র সম্বন্ধে বন্ধুদের কাছে কিছু অবগত হয়েছি। তোমায় দেখবো অনেক দিনের ইচ্ছা। চিঠি পেয়ে সত্যই খুসী হয়েছি।......আমাদের “নব-যৌবন” (Now-youth) পত্রিকায় অনুগ্রহ করে তোমার প্রবন্ধ কিছু পাঠিয়ো।......মত বা যুক্তি যাই হোক্‌না কেন,—একটা অংশ বাকী সমস্তটুকুকে দাবিয়ে রাখবে, এ কখনই যুক্তি-যুক্ত নয়।”

রক্ত অপরিষ্কার বা বিষাক্ত হয়ে গেলে সারাঅঙ্গে ছোট বড় স্ফোটকের আবির্ভাব হয় তখন অস্ত্রোপচার অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে, যেটা সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক—তারই চিকিৎসা হয় সর্ব্বপ্রথম, পরে অস্ত্র অন্যগুলির কাছেও এগিয়ে আসে। চীনের বিভিন্ন অঙ্গ রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, সমাজ, সংসার সবাই উপযুক্ত শুশ্রূষার অভাবে অন্তরে জীবনীশক্তির চেয়ে জীবন-সংহারক-শক্তিরই সঞ্চয় করেছে বহুকালের উপেক্ষিত-জীবনের প্রতিদিনে; তাই তার যখন চিকিৎসার সুরু হলো চিকিৎসকের অস্ত্র সব অঙ্গই স্পর্শ কর্‌লে। কন্‌ফুসিয়ানিস্‌ম’র বিরুদ্ধে অভিযানের অনুসরণ করে আরও অনেক ছোট বড় অভিযান সুরু হয়ে গেল। পূর্ব্ব-পুরুষকে পূজা করা অতীতের বিষয় হয়ে গেল।

“সংসারবিপ্লব” (Family Revolution) পত্রিকায়এক তরুণ

লিখলে "অনুপযুক্ত মানুষের সৃষ্টি হয় অনুপযুক্ত সংসার থেকে ; অক্ষম জাতির সৃষ্টি হয় অনুপযুক্ত সংসারের সমন্বয়ে।......নীচ সমরপ্রিয় ব্যক্তিদের অথবা হীন রাজকর্ম্মচারীদের দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই, দুর্নীতিপূর্ণ-পরিবারেই তারা জন্মায়।......আমাদের সংসারই সব অনিষ্টের মূল !......রাষ্ট্র-বিপ্লব ফলপ্রসূ হবেনা ! সমাজের দূর্নীতিকে আক্রমণ করার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্চে পরিবারের মধ্যে বিপ্লবের সূচনা করা। আমাদের চীনা-সংসারের নিয়মকানুন কয়েক হাজার বছর আগে বাঁধা হয়েছে। দুদিকদিয়ে এই সংসার সমাজের অনিষ্ট করে। এক হচ্চে সংসারের ওপর পিতার একাধিপত্য, দ্বিতীয় হচ্চে সংসারের আকার বা পরিমাণ। এদের দরুণ নিম্নলিখিত অনিষ্টের সৃষ্টি হয় :—

(১) ব্যক্তিত্বের অবমাননা হয়

(২) পরাধীনতার মোহের সৃষ্টি হয়

(৩) ব্যষ্টির উন্নতি আহত হয়

(৪) বৃহৎ-পরিবারে কলহ অবিচ্ছিন্ন থাকে,—

সুতরাং ব্যষ্টির সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, সংসারে শান্তির জন্য, এবং সর্ব্বোপরি জাতির উন্নতির জন্য চীনা-সংসারকে সরল এবং সহজ করে গড়্তে হবে ; পরিবারভুক্ত হ'বে শুধু স্বামী আর স্ত্রী।...

"প্রাচীন-নিয়মে-গড়া সংসারের সবচেয়ে দূষণীয় হচ্চে তার কৌলীন্যভাব।......পিতামাতার প্রতি সন্তানগণ ভক্তিপরায়ণ

হবেনা একথা আমি বলিনা। আমি শুধু এই বলতে চাই যে, সেই সম্পর্কের ভিত্তি হবে স্বাভাবিক মনুষ্যোচিত স্নেহ।...প্রবীণ এবং নবীন, পিতামাতা এবং সন্তান এদের সম্বন্ধ সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামীর দশটা বিবাহ করবার কী অধিকার আছে, যখন বিধবা স্ত্রী পুনর্ব্বিবাহে বঞ্চিত? বালক সংসারের দাস, আর বালিকা দাসী হয়ে থাকবে কেন?......এ যুগ সাম্যের যুগ; প্রাচীন সংস্কারকে এই মুহূর্ত্তে ধ্বংস করতে হবে! আভি-জাত্যের বিষকে সাম্যের অমৃত দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।...একমাত্র লক্ষ্য হবে সুখশান্তিময় সংসারের সৃষ্টি করা।...যত কিছু কুসংস্কারের ধোঁয়া—সংসারের আকাশ ভারাক্রান্ত করে রেখেচে—তাকে সৎ-যুক্তি-সম্পন্ন মনের হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে হবে। যত কিছু মিথ্যা আচার, অনুষ্ঠান, সবকেই সত্য এবং সহজ করে তুলতে হবে। স্ত্রীপুরুষের বিবাহের ভিত্তি হবে প্রেম।...গুরুজনদের এতে হস্ত-ক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু পুরাতন নিয়মানুসারে—এ বিষয়ে তাঁদের অসীম ক্ষমতা। এ সব রীতি নীতি আমাদের আধুনিক জীবনের অভাবপূরণে অক্ষম। সব সামাজিক চাঞ্চল্য এবং দুর্নীতি আমাদের এই প্রাচীন, একঘেয়ে সংসার-সম্ভূত। পিছে পড়ে থাকতে কেউ চায় না; আমরাও তা চাইনা।—এই সংসারের দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তনই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কাম্য।"—

চীনের বিপ্লব রাষ্ট্রজগত ছাড়িয়ে সংসার, সমাজে পরিব্যাপ্ত হ'ল। আমাদের দেশে বিপ্লবী বলতে যাঁদের বোঝায়, তাঁরা কর্ম্ম

ক্ষেত্র রাষ্ট্রের আঙ্গিনায় গণ্ডীবদ্ধ করে রেখেছেন। বিপ্লবের অর্থ তাতে আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরিপূর্ণ ভাবে নয়। বিপ্লবী কে? যে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের ভোগকে সত্য ও সুন্দর কর্‌তে চায়, যে দেশ বল্‌তে বোঝে, দেশের প্রত্যেক মানুষ—সংসার, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র সবের মধ্যেই স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ।

১৯১১ সালের বিপ্লব যখন সম্পূর্ণভাবে সফল হলোনা, তখন তরুণ-চীনের দৃষ্টির প্রসারতা বেড়ে গেল; ১৯১৫ সালে যৌবন-অভিযান মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌লো। শাসনতন্ত্রের কলকজা ছাড়িয়ে তরুণের দৃষ্টি তখন সমাজ, সংসার, ধর্ম্মের প্রতি নিবদ্ধ।

—পাঁচ—

বিশ্ব-বাণীর আশ্রয় এযে
কম-কমলের হয় যে চাষ।
কেতা-দুরস্ত, বুলিতে চোস্ত
গড়ে না এ কভু রাজার-দাস ॥

এগড়ে মানুষ, আকাশ ধরা'র
দুর্ব্বার-বায়ু-সম-স্বাধীন
অমানিশীথের কালো-মোহ টুটি
আনে এ প্রভাত—আলোর দিন ॥

উত্তেজনা যখন কমে আসে, দৃষ্টি তখন একটু গভীর ও সূক্ষ্ম হয়। তখন, যা'কে নিয়ে জীবনের নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি দিন বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত করা গেছে—তা'র অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত ভেবে দেখবার সময় আসে। তখনই সুরু হয় গড়া'র কাজ (Constructive Work)। অত্যাচারী রাজতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করে মানুষের শ্রেষ্ঠ কামনা প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কল্পনা কিয়ৎ পরিমাণে সার্থক হ'ল'—১৯১১ সালের বিপ্লবপুরস্কারে। কিন্তু জাতি হিসাবে চীনের, জগতের কাছে তখনও কিছু দেখাবার নেই; সেই পুরাকালের কুসংস্কার তখনও চীনের প্রত্যেক নর-নারীর দৈনন্দিন জীবনে আবর্জ্জনার মত অসহীয় হয়ে রয়েছে। তা'কে দূর করতে গেলে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রচারের দরকার। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষানিকেতন পুরাতনের মোহে আচ্ছন্ন; তাই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি সুরু হলো জাতির পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে।

পিকিংএ'র "ন্যাশানাল্ য়ুনিভার্সিটী' হচ্চে এই নব-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র।

১৯১৬ সালে Dr Tsai Yuan-pei ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন National University'র Chancellor হয়ে। ১৯১৭ সালের জানুয়ারিতে তিনি প্রথম বক্তৃতায় তাঁর ইপ্সিত ছাত্রজীবনের আদর্শের উল্লেখ করে বলেন,—

"—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হিসাবে আমার তিনটী কথা তোমাদের বল্‌বার আছে। প্রথমতঃ, তোমরা কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?......এটী হচ্চে শিক্ষাকেন্দ্র; মৌলিক গবেষণার আশ্রয়। প্রবাদ আছে এসব জায়গা দুষ্ট, কারণ—এ নাকি শুধু রাজ-কর্ম্মচারী-গড়া-কল? তাই বোধ হয় আইনের ছাত্রই বেশী বিজ্ঞানের নেই বল্‌লেই চলে। এদের জানা আছে যে আইন অধ্যয়নই রাজদ্বারে পৌঁছাবার বড় রাস্তা? যদি, তোমাদেরও সেই উদ্দেশ্য থাকে ত, এখানে এসে আর ফল পাবে না; অন্যত্র যাও।

দ্বিতীয়তঃ, নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে দু এক কথা। বর্ত্তমানে সামাজিক আচার, ব্যবহার দিন দিন বিশৃঙ্খল ও হীন হতে চলেছে! এই পিকিং'এর সমাজ চীনের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য। সামাজিক রীতিনীতিই জাতীয়-জীবনের মাপকাটী। সামাজিক অবস্থা যদি অবনতির পথেই চলে ত'—ভবিষ্যতের অবস্থা কী হবে? অবনতির পথে এই গতিকে ফিরাতে ধীমান, শক্তিমান, বিদ্বানের

আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তোমরা ; তোমাদেরই এ ভার নিতে হবে।......যদি আমরা নৈতিক-জীবনের পুনঃর্গঠনের চেষ্টা না করি, পারিপার্শ্বিক দুর্নীতিপূর্ণ আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে শুধু লেখাপড়াই করতে থাকি ত',—অপরের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করা অথবা অপরকে অনুপ্রেরিত করার আশা আর থাকে না।

আমার শেষকথা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বন্ধুত্ব সম্পর্কে। ইউরোপে এমন অনেক দোকান দেখেছি যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যেও সহজ বন্ধুত্বের ভাব সুস্পষ্ট। ইউরোপে যদি এত নগন্য পরিচয়েও মৈত্রীভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে ত' আমাদের এ আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতায়ও তা'কি হ'তে পারে না ?"—

কাজের পথে প্রথম পা, পড়্লো! নীতি সংস্কারের প্রথম অধ্যায়-স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হলো—"Tho Society for the Promotion of Virtue. (নৈতিক উন্নতি সঙ্ঘ) এ'র সভ্যেরা ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য হবে না, সরকারী চাকরী নেবেনা, জুয়া, বেশ্যা'র সংস্পর্শে আস্বে না। সভ্য-সংখ্যা হলো এক হাজার। দেখতে দেখতে অসংখ্য সংঘ, সমিতি গড়ে উঠলো—সঙ্গীত, সাহিত্য ও ভাষা-শিক্ষার আদর্শ নিয়ে।

শিক্ষকদের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়প্রত্যাগত অনেকেই ছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে আদর্শ বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো। দেশবিদেশের অভিজ্ঞতা চীনের ভবিষ্যৎ

উন্নতিকল্পনায় প্রয়োগকরার আলোচনা পুরাদমে চললো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ই যে চীনের সব বিপ্লবের কেন্দ্র হয়েছে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে গাছ আকাশের নিলীমাকে বুকের আনন্দের মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছে ত'াকে আওতার মধ্যে আয়ত্ব করতে গেলেই সে বিদ্রোহ করে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবে।

সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীরের অন্তরালে নব-সভ্যতা-সন্ধান-যাত্রার পরিকল্পনা হচ্চে আর বাইরে পিকিং'র সমাজ তখন নির্জীব, বিশৃঙ্খল! এপিঠ যখন আলোর আবাহন-গীতিতে মুখর ওপিঠ তখন আঁধারের আতিশয্যে অস্থির!

বিশ্ববিদ্যালয়ের দেহে, মনে যখন সংস্কার কার্য্য সুরু হয়েছে,—পশ্চিমের দিনরাত তখন সমুজ্জল করে রেখেছে পৃথিবীব্যাপী সমরানল! যেন আর এক পা' এগুলেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে! পিকিং'এর ছাত্রেরা এই ধ্বংস-লীলার উৎপত্তিসম্বন্ধে প্রশ্ন তুললে। তারপর যুদ্ধ থেমেও গেল। সারা চীন 'মিত্র'-জাতির, বিজয়োৎসবে মেতে উঠলো।......

তরুণ-সম্প্রদায়ের সত্বাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা জাতির আত্মোন্নতির পথে উৎকৃষ্ট আদর্শ। প্রবীন মনের সাহায্য ও নেতৃত্ব হয়ত এ আদর্শোদ্ধারের চেষ্টায় অস্বাভাবিক নয় কিন্তু তরুণকেই কর্ম্ম শক্তির স্বাভাবিক কেন্দ্র হ'তে হবে। ব্যষ্টির জীবনে যৌবনেই বিপ্লব আসে, এই বিপ্লবপর্য্যায় অতিক্রম করে সে পরিণত-যৌবনে জীবনকে শান্ত সমাহিত করতে সক্ষম হয়।

জাতির-জীবনেও বিপ্লব অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে, বিপ্লবের ইন্ধন যোগায় তরুণসম্প্রদায়,—পরে সে কাল অতিবাহিত হলে, সমগ্র জাতিই আত্ম প্রতিষ্ঠার শান্তি ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। এই নিয়মের একান্ত-অধীন চীনের তরুণও সাধনার পথে এগিয়ে চল্‌লো। এই সময় Renaissance Society (পুনরুজ্জীবন-সঙ্ঘ) প্রতিষ্ঠিত হলো। "The Renaissance" নামক মাসিক পত্রে এরা সমালোচকের সুক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা জনসাধারণের সমক্ষে, উন্মুক্ত করে দিলে। প্রথম সংখ্যায় তারা লিখলে,—

"সমাজ আমাদের অদ্ভুদ রকমের। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা বলে থাকেন, চীনে 'জনতা' আছে, 'সমাজ' নেই। চীনের এই 'সমাজ'—২০০০ বছরেরও অধিক প্রাচীন, আধুনিক অভাবপূরণে সে একেবারে অক্ষম। ন্যায়তঃ, এ কথা অসত্য নয়। আমাদের জঘন্য আচার ব্যবহারগুলি স্মরণ কর্‌লেই যথেষ্ট হবে; সবই প্রায় নিষ্ঠুর, অমানুষিক। মনুষ্যত্ব বিকাশের কোনও পথই খোলা ছিল না। মানুষ আমরা, ছিলাম কুকুর, ভেড়ার মত,—জীবন মরণ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ।......

"প্রকৃত শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং আত্মনির্ভরতার বিকাশক। ইউরোপের "রেনেসাঁস" আন্দোলন পণ্ডিতসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য অমান্যের নিদর্শন।

"এই পত্রিকার সাহায্যে আমরা—সারা চীনের ছাত্রদের সঙ্গে

সঙ্ঘবদ্ধ হতে চাই—আধ্যাত্মিক মুক্তির যুদ্ধে। আমাদের আশা, চীনের সব ছাত্রই আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিপোষক হবে। পরনির্ভরতা ছেড়ে তারা আত্মনির্ভর ও সূক্ষ্মদর্শী হবে। নিজেদের বর্ত্তমান সমাজের না ভেবে ভবিষ্যৎ সমাজের অন্তর্ভূত বলেই ভাব্‌বে। সমাজ কর্ত্তৃক বিজীত না হয়ে তাকে জয় করবার শক্তি ও ব্যক্তিত্ব অর্জ্জন কর্‌বে। আমাদের এ পত্রিকার উদ্দেশ্য সমালোচক হওয়া।”

এমনি করে সমাজ সংস্কারের পথে যৌবন অভিযান চললো। পুরাতনের স্থলে নূতনকে অভিষিক্ত কর্‌তে হলে শুধু নূতনের স্তুতি-বাক্যে মুখর হলেই চল্‌বেনা, পুরাতনের প্রকৃত ত্রুটী, অন্যায়, অস্বাভিকতাকে সুক্ষ্ম সমালোচনার বন্যায় ভাসিয়ে দিতে হবে।

পূর্ব্বোক্ত সঙ্ঘের অনুরূপ আদর্শ নিয়ে আর একটী সমিতি গড়ে উঠলো—“Young China Society” (নব্য-চীন-সঙ্ঘ)। সমিতির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তারা বললে—

“চীনকে নবীন করে গড়তে চাই। বিজ্ঞানের সুক্ষ্ম যুক্তি আমাদের পথের আলো। সমাজ-সেবাই আমাদের কাজ। আমাদের অস্ত্র হচ্চে—যুদ্ধ—কর্ম্ম—ধৈর্য্য, প্রকৃত জীবন। চিন্তা-জগতে আমরা বিপ্লব আন্‌তে চাই,—জীবনকে পুনর্গঠিত কর্‌তে চাই।”

“আমাদের বন্ধুরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাক্‌লেও—ভাবের আদান প্রদান নিয়মিত চলছে—মনুষ্য-জীবনের তাঁরা কি সংজ্ঞা দেন,

নিজেদের জীবনকে তাঁরা কি চক্ষে দেখেন, আধুনিক সমাজ সম্বন্ধে তাঁদের কি মত, ইত্যাদির আলোচনা নিয়ে। এ সঙ্ঘের মুখপত্র হচ্চে—"Young China" (নব্য-চীন)।

সেই আদিম যুগে প্রথম-স্ত্রী-পুরুষকে নিয়ে প্রথম-সংসারের সুরু হলো ; হাজার হাজার বছরের অজ্ঞাত ইতিহাসের পাতায় তারপর মানুষের সাংসারিক জীবনের কোন্ পর্য্যায় কেটে গেল কল্পনা ছাঁড়া অন্য কেউ তার বিবরণ দিতে সক্ষম নয়। আবার ইতিহাসের পাতায় আবার যখন তার পরিচয় হলো তখন সে সমাজ-বদ্ধ। সেই সমাজ বিভিন্ন যুগে পরিবর্ত্তনের সুযোগকে ব্যবহার করে আজ বিংশ শতাব্দীর বুকে এসে পড়েছে ; আজও সে পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা রাখে। তারই জন্য এক একটী জাতির কত কল্পনা, কত চেষ্টা, কত কর্ম্ম, কত ত্যাগ। সামাজিক পরি-বর্ত্তনের প্রবাহ চীনেরও বুক বেয়ে চললো।......

—ছয়—

কহে বীনাপানি, বীণা মোর বাজেনাক'—
তন্ত্রের সুর স্বর্গে পড়েছে বাধা
আমি শিখরেতে, মূলেতে তোমরা থাক ;
ব্যবধান-ব্যথা ব্যর্থ করেছে সাধা।

নিয়ে যাবে মোরে ভাষাহারাদের দলে ?
শুনাব তাদের শুনিব তাদের কথা
কোটীকণ্ঠের কলরোল কোলাহলে
ঘুচে যাবে সব দীন-হীন-নীরবতা ?

অতীত ইতিহাসের পরাক্রমশালী, প্রজারঞ্জক রাজা। রাজায় প্রজায় ততটুকু সম্পর্ক ; যতখানি সম্পর্ক বর্ত্তমান, রাজার স্বর্ণ-মণ্ডিত হস্তিদন্তের বিরাট সিংহাসনে আর রাজারই অন্দরমহলের একঘরে 'উত্তর-পশ্চিম'-কোণের গোসলখানার ব্যঞ্জন-রঞ্জিত পাচকের ঝুল্‌পড়া টুলটীতে। এহেন রাজার সভায় গিয়ে পড়লো বিংশ শতাব্দীর এক 'ডেমোক্র্যাটীক্' যুবক !......একদিন বুঝ্‌তে পারা গেল রাজ্য টলয়মান্ ! রাজারই এক ভগ্নী—ভ্রাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুরু করে দিয়েছেন ! রাজার পারিষদবর্গ সন্ত্রস্ত। ওদিকে নিরপরাধ প্রজাদের ওপর রাজ-ভগিনী নির্ম্মম অত্যাচার সুরু করেছেন। বিংশ শতাব্দীর যুবক বিদ্রোহ-দমনের ব্যবস্থা গোপনে করে রেখে, রাজাকে তাঁর পদবীর অর্থ বোঝাতে গেলো। রাজা তাকে বল্‌লেন,—,আমি একলাই রাজা, প্রজা বাকী সব। দুয়ের মধ্যে অনন্ত প্রভেদ। তারা যে রাজা নয় আমিই রাজা, এই সার

কথাটুকু জানি।' যুবক বল্‌লে,—'তুমি যে রাজা নও, সাধারণ একজন লোক—এই কথাটাই সত্য।' রাজা বল্‌লে,—'কখনই নয়। যে কোনও সময়ে, যে কোনও অবস্থায়, যে কোনও লোক আমায় রাজা বলে চিন্‌তে পার্‌বে।' যুবক বল্‌লে 'এই কথা? তবে এস।' তারপর সে রাজার সযত্ন-বর্দ্ধিত শ্মশ্রু মুণ্ডন করে, বাবরী চুল ছেঁটে দিয়ে,—সাধারণ চাষার বেশ পরিয়ে দিয়ে নিজেও তাই পর্‌লে। খিড়্‌কী দিয়ে দুজনা প্রাসাদ ত্যাগ কর্‌লে। পথের মধ্যে এক কৃষকের বাড়ীতে অত্যাচারীর উপদ্রব তখন চলেছে। বৃদ্ধ-কৃষককে আঙ্গিনার একটা গাছের সঙ্গে বেঁধেছে, পত্নী, পুত্রকে প্রহার কর্‌তে কর্‌তে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর খড় আর ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে! রাস্তায় দুজনা দাঁড়াল। রাজা যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন হাঁ করে, দেখ্‌ছ কি? চল ওদের বাঁচাই গে? উত্তরের অপেক্ষা না করেই সেই কৃষকের বন্ধন উন্মোচনে তৎপর হলেন! অত্যাচারীরা রাজাকে বন্দী কর্‌লে। চীৎকার করে রাজা বল্‌লেন, "কী এত বড় স্পর্দ্ধা! জানিস্ আমি রাজা?" তারা অট্টহাস্য করে বল্‌লে, 'তাই নাকি? রাজা না পাগল?'...

দিনকতক পরে যুবক বিদ্রোহ দমন করে রাজাকে উদ্ধার করে শুধালে, 'বলতো তুমি কে?' উত্তরে রাজা বল্‌লেন,—আগে আমি সাধারণ মানুষ, তারপর আমি সবার সম্মতিক্রমে রাজা।"—যুবক বল্‌লে, 'আভিজাত্যের গর্ব্বকে ক্ষুণ্ণ না কর্‌লে তোমার স্বরূপ ও

শক্তি বুঝতে পারতে না।' রাজা বল্‌লে,—"প্রজাদের অন্তরের সঙ্গে বুঝতে না পার্‌লে, তাদের অন্তরে আমার স্থান কী করে হবে? তাদের অভিলাষের স্বাভাবিক বিকাশে আমার অস্তিত্ব। আজ আমি ধন্য! আমি নিজের নয়, দুচার জন আত্মীয় কুটুম্বের নয়, আমি সবা'য়ের—জনসাধারণের।...

আভিজাত্যের রক্ষাকবচে সযত্ন-রক্ষিত ঐ রাজারই মত ছিল চীনের পুঁথি, পুস্তকের ভাষা। জনকতক প্রকাণ্ড পণ্ডিতেরই তা' ছিল একচেটে, জনসাধারণ তার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তোনা। আমাদের রাজভাষা, সংস্কৃতই যদি বাণীবন্দনার অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপায় হতো, বাংলাভাষার উৎপত্তি ও লালন পালনের কোনও সম্ভাবনা না থাক্‌তো, তাহলে আমাদেরও অবস্থা ঐ চীনেরই অনুরূপ হতো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা হয়নি; বাংলাভাষা আমাদের সাধারণের ভাবপ্রকাশের খুব সহজ উপায়। কিন্তু চীনে তা ছিল না। যৌবন অভিযাত্রীদের সব কাজই বিফল হতে লাগলো—শুধু জনাসাধারণকে তারা নিজেদের বোঝাতে পারেনি বলে। ভাষা সংস্কারের দিকে তখন তাদের দৃষ্টি পড়্‌লো। তারা কথ্য বা চলিত ভাষাকে কাগজে কলমে সচল করবার ব্যবস্থা কর্‌তে লাগলো। আভিজাত্যের উচ্চসিংহাসনে অধিষ্ঠিত অহঙ্কারী 'পণ্ডিতী-ভাষা'কে তখন তারা জনসাধারণের পর্ণকুটীরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবার উপায় খুঁজতে লাগলো; যাতে তারা সগর্ব্বে বল্‌তে

পারে,—'আমাদের ভাষা পণ্ডিতের নয়, মুষ্টিমেয় বিদ্যার্থীর নয়, সে সবায়ের—জন-সাধারণের'।

প্রাচীন অলঙ্কৃত ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান সহসা সুরু হয়নি। এ'র মূলের কাজটুকু করেছিলেন Dr. Su Huh। তাঁর অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভা নিয়ে তিনি গদ্যে, পদ্যে, পরীক্ষা সুরু করে দিলেন,—'Poi-Hua'-নামক কথ্য-ভাষার সাহায্যে। সুরুতে তেমন উৎসাহ পান্‌নি, কিন্তু আমেরিকা হতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অসংখ্য সুচিন্তিত যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের সাহায্যে তিনি সমর্থনকারীদের দল বেশ ভারী করে নিলেন। ১৯১৭ সালেই ভাষা সংস্কারের আলোচনার আসর বেশ সরগরম হয়ে উঠলো। Su-Huh'র মতে, লিখিত ভাষার স্থলে কথ্য-ভাষাকে স্থান দেওয়া—বিপ্লব-অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ। তিনি এক প্রবন্ধে লেখেন,—"প্রাচীন ভাষার বিধিবাঁধনের কবল হতে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যেই আমরা চীনের কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দেবো। চীন-সাহিত্যের এত শোচনীয় দুর্গতির কারণ কি? একটা মৃত, অপ্রযোজ্য ভাষাকে জাতির ভাব ও মনোবিকাশের উপায়স্বরূপ দাঁড় করান'র বৃথা চেষ্টাই এর কারণ। আধুনিক ভাব-সম্পদকে সম্পূর্ণ কর্‌তে গেলে প্রাচীন ভাষাকে স্থানচ্যুত কর্‌তে হবে। পুরাতন পাত্রের আর নূতন সুরা রক্ষা করার ক্ষমতা নেই,"—

আর একটী প্রবন্ধে তিনি লেখেন;—

"অদ্যাবধি চীনের যে সাহিত্য বর্ত্তমান, সে শুধু মুষ্টিমে[illegible] লোকে-

রই সাহিত্য! উচ্চস্তরের লোক বল্‌তে যাঁদের বোঝায় এ হচ্চে তাঁদেরই।...

যে দেশ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় যত্নবান তার ভাবপ্রকাশের উপায়টী এত সরল হওয়া উচিত যে, অধিবাসিদের প্রত্যেকেই যেন তাকে সহজে উপলব্ধি কর্‌তে সক্ষম হয়। চীনও যদি প্রজাতন্ত্রেরই পক্ষপাতী হয়, তাকে এমন ভাষার প্রবর্ত্তন কর্‌তে হবে যা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনগুলিকে সুচারুরূপে প্রকাশ কর্‌বে।"

সাহিত্য-বিপ্লবের সাহিত্যিক ব্যাখ্যা করে তিনি পত্রান্তরে লিখেন,—

"সাহিত্য-বিপ্লবের প্রথম কামান যখন গর্জ্জে উঠলো, তখন যেন এই বাণীই ঘোষিত হলো—'পুরাতন বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দাও,—নূতন বিশ্বাসের সৃষ্টি হোক্'; প্রাচীন নীতিবাদ লুপ্ত হোক্ নূতনের স্থান সঙ্কুলান করে। পুরাতন জীবনধারার শেষ করে দাও—নূতনের অভিষেকে প্রস্তুত হও!' সাহিত্যবিপ্লবের গোপন কথাটী হচ্চে এই যে, নূতন ও পরিবর্ত্তিত আধুনিক বিশ্বাসকে ব্যক্ত কর্‌তে হ'বে।"—

ধর্ম্ম সম্বন্ধে চীনা-তরুণের মনোভাবের কথা আগেই বলেছি; কেন, এবং কি করে তারা অন্তঃসারশূন্য, অক্ষম কন্‌ফুশিয়ানিস্‌ম'র নির্ম্মম সমালোচনা সুরু করে দিলে। তাদের যুক্তি এই যে,—মানুষ নিরাপদে বাস করবার জন্য ইঁটপাথরের বাড়ী তৈরী করে। অতীতে কোন্ পূর্ব্বপুরুষ তা' করে গেছেন, বংশ-পরম্পরায় তাকে

ভোগ করে আসছি ; আজকে যদি দেখি তার কঙ্কালখানিই প্রধান হয়ে উঠেছে, তার আশ্রয় আর নিরাপদ নয়—তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি ? তখন আমরা তার সংস্কারে লাগি ; আবশ্যক হলে তার আগাগোড়া ধ্বংস করেও নতুন ইমারৎ তৈরী করি। সেটা পূর্ব্বপুরুষের সৃষ্টি বলে বর্ত্তমান অধিকারীদের সংস্কার বা ধ্বংসাধীন নয়,—এ যুক্তি তখন খাটেনা। তার ধ্বংসস্তুপের ওপর তখন নূতন ইমারৎ প্রস্তুত হয়। তেমনই, আধুনিক-অভাব-পূরণে অক্ষম সমাজ, সংসার, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও রাষ্ট্র সবায়েরই পরিপূর্ণ সংস্কারের আবশ্যক।

এবার তরুণদের নজর সাহিত্যের ওপর গিয়ে পড়লো। চীনে এই সাহিত্য-বিপ্লবীদের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠলেন জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক Hu Suh। সাহিত্য সেবাই তাঁর জীবনের ধর্ম্ম হলো। ১৯১৫ সালে নিখিল-চীন-ছাত্র-সম্মিলনে'র প্রধান আলোচ্য বিষয়ই ছিল, "চীনাভাষাকে সহজ করার উপায়।"

১৯১৬ সালের জুনমাসে Hu Suh সাহিত্য-বিপ্লব ঘোষণা করে লিখলেন,—

"চলিত-ভাষার বাক্য এবং তার প্রয়োগ কটু, এই চিরন্তন ধারণা আমাদের ত্যাগ করতে হবে। আসলে, আমাদের প্রত্যহ ব্যবহৃত কথ্যভাষার বহুবাক্য এবং পদ-সমষ্টি, খুব ভাব-ব্যঞ্জক, সুতরাং সুন্দর। বাক্য বা ভাষা বিচারের মানদণ্ড হবে তাদের সজীবতা ও প্রাঞ্জলতা ; কোনও গোঁড়া নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির আনুকুল্য

স্বীকার নয়। এদেশের লোকেরা যে ভাষায় কথা বলে তা' সজীব; জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি এতে প্রতিফলিত হয়। এই অকৃত্রিম, সুন্দর ভাষার সাহায্যে ভবিষ্যতে এক বিরাট জীবন্ত সাহিত্য গড়ে তোলা খুবই সম্ভব। আমার এই বক্তব্যগুলি সুস্পষ্ট করবার অবসর এখন আর নেই; আমি শুধু পাঠকদের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, তাঁরা যেন বিশ্বাস করেন এই কথাগুলি যার মুখনিঃসৃত সে বছর কয়েক আগে, 'চীন-সাহিত্য মৃত' এই কথা যেই বল্‌তো তাকেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে ফেল্‌তো।"—

কিছুদিন পরে, ভাবাসংস্কার কার্য্য সুরু করে দিয়ে তিনি লিখলেন,—

"প্রথম আমি 'Poihwa' ভাষা (কথ্য ভাষা) ব্যবহার করি ১৯০৬ সালে, সাংহায়ের এক সাপ্তাহিক পত্রে ছোট গল্প লিখে। ১৯০৭ সালে পীড়িত হওয়ার দরুণ স্কুল ছাড়তে হ'ল। পীড়িত অবস্থায় প্রাচীন কবিদের কবিতা পড়তুম্। সেই সময় থেকে আমেরিকা যাবার আগে পর্য্যন্ত শ'দুয়েক পদ্য লিখে ফেলি। ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত প্রাচীন সাহিত্যের ওপর দারুণ বিতৃষ্ণাই ছিল। সে বছর আমেরিকায় আসি। আমেরিকা অবস্থানকালে প্রথম দু'বছরে মাত্র ২।৩টী কবিতা লিখি। ১৯১২ সালে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'বার পর থেকে Yen আর Young'র সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হ'ল। কবিতা লেখবার

উৎসাহও হ'ল নতুন করে। সে অবস্থার বর্ণনা আমার নিম্ন-লিখিত কবিতাতেই পাওয়া যাবে—

"৭রের বছর বন্ধু দুজন এলো
সুদূর দেশের বার্ত্তা বুকে নিয়ে
পাহাড়-পুরে ঝড় বাদলের খেলা ;
ব্যর্থ হবে লগ্ন শুভ কিএ ?
চুমুক দিয়ে মিষ্টি গরম চা'—
বসনু তিনে লিখ্‌তে কবিতা ॥
সেই থেকে মোর বুকের কোণের কবি
উঠ্‌লো জেগে ; ঘুমিয়ে ছিল মরে,
কাব্য-বিহীন প্রাচীন-জীবন শেষে
সুরু হলো নতুন জীবন ওরে !"

"পাঁচ বছর ইথাকাতে ছিলুম্। এ সময়ে সাহিত্যের বিশেষ কিছু না করলেও, পাশ্চত্য সাহিত্য সম্বন্ধে খানকতক বই পড়ে ফেলি। আমার সাহিত্য-জীবনে এর যথেষ্ট প্রভাব বর্ত্তমান ; কবিতা লেখার জোর এ'র থেকে অনেক পেয়েছি। ১৯১৪ সালে ৮ই জুলাই তারিখে লিখি, 'আজকাল আমার কাব্য কোনও শ্রেণীর প্রভাবমুক্ত, অথচ আমি নিজে কোন শ্রেণীর স্রষ্টা নই। অনুকরণে আমার স্পৃহা নেই ; আমার লিখনভঙ্গি, বা কথা, বা পদ কোনও প্রাচীণ পদ্ধতির অনুরূপ নয়।"—

সাহিত্য-সংস্কারের কাজে Hu Suh কে শুধু যে নির্ম্মম

বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল তা' নয়, বহুকাল নিঃসঙ্গ থাক্‌তে হয়েছিল। ক্রমশঃ তাঁর প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হলেন। চলিত-ভাষায় Hu Su'র সর্ব্বপ্রথম কবিতাটী 'প্রজাপতি' সম্বন্ধে লেখা। এই কবিতাটীতে সঙ্গীহীনতার সুন্দর সংক্ষিপ্ত ছবি কবি সুসংবদ্ধ ছন্দে এঁকেছেন,—

"দুটী সে মনোলোভা
হরিৎ প্রজাপতি
আকাশ পথে ফেরে উড়ে'—,
একটী এলো ফিরে—
কি যে কি হলো মতি ;
দ্বিতীয় একা রহে দূরে
সাথী ত' গেল ছাড়ি'—
কেন, কি অকারণে,
সে মরে বায়ু পথে কেঁদে
আকাশে নাহি মায়া
শুধু সে আছে মনে
নিরালা ফাঁকা-বুকে বেঁধে।"

এই হলো তাঁর সুরু ; সাহিত্য-সম্পদকে শ্রেণী নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন কর্‌বার প্রথম সুযোগ। পরে কার্য্যক্ষেত্রে তিনি দেখ্‌লেন যে সহকর্ম্মীদের মধ্যেও কিছু গলদ রয়েছে ; পুরাতনের মোহ তাঁরা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে

পারেন নি। তাই তিনি "New Youth" (নব-যৌবন) এর সম্পাদককে এক পত্রে লেখেন,

"...আমার মনে হয় যাঁরা প্রাচীন পদসমষ্টি ও রচনা-ভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখতে ইচ্ছুক তাঁরা নতুন কিছু সৃষ্টি করার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বল; বর্ত্তমানের ওপরেই তাঁদের সমস্ত নির্ভর। প্রকৃতই আমাদের সাহিত্য জীর্ণ, জঘন্য, দেউলে হয়ে গেছে! এর প্রধান কারণ, রচনা-ভঙ্গীর পায়ে সাহিত্যের সারাংশটুকু বলি দেওয়া। ...প্রবীনেরা বলতেন, বক্তৃতায় যদি সাহিত্যিক-ভঙ্গী না থাকে ত' সে বক্তৃতা ফলপ্রদ হয় না। আমাদের উত্তর, 'বক্তৃতায় যদি বাস্তব, অর্থপূর্ণ কিছু না থাক্‌লো ত অর্থহীন রচনাভঙ্গী নিয়ে লাভ কি?...আমি চাই সাহিত্যবিপ্লব, পুরাতনের কাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলবো। কাজটা দুরূহ বটে, কিন্তু সার্থক হ'লে প্রভূত উপকার হবে।"...

এই পত্রের অব্যবহিত পরেই New Youth (নবযৌবন) পত্রিকায় একটী প্রবন্ধে লিখলেন—

"অনেকেই আজকাল সাহিত্য-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌ছেন। লেখকের বিদ্যা পরিমিত; কিন্তু বন্ধুবর্গের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করে কতকগুলি অবশ্য-কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেলেছি। আমার মতে সে গুলি একান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন (১) রচনার বস্তু থাকা চাই, (২) পূর্ব্ব-পুরুষদের অনুকরণ করবার ইচ্ছা ত্যাগ কর্‌তে হবে। (৩) ব্যাকরণ ব্যবহার কর্‌তে হবে। (৪) নিছক

ভাবপ্রবণতা এড়াতে হবে। (৫) সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাচীন বিধি, ব্যবস্থা সব কিছু পরিত্যাগ করতে হবে। (৬) প্রাচীন পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পদসমষ্টি ত্যাগ করতে হবে। (৭) পাণ্ডিত্যের মাপকাটিতে মাপা 'অশ্লীল' বাক্য ব্যবহারে ভীত হলে চলবে না। এই সব যুক্তি সম্বন্ধে কিছু ভুল থাকতে পারে; কিন্তু এসব অনেক পরিশ্রমের ফল, মূল্য এ'র সুধীজনের কাছে হবেই,"......

Hu Suh'র এই প্রবন্ধ চীনের মর্ম্মে গিয়ে পৌছেছিল। তিনি 'সাহিত্য বিপ্লব' কথাটী ব্যবহার না করে, 'সাহিত্য সংস্কার' কথাটী ব্যবহার করতে লাগলেন। কারণ পণ্ডিতদের আঘাত দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাঁদের স্বাচ্ছন্দ নির্ব্বিঘ্ন করবার জন্য তিনি খুব নম্রভাবে প্রবন্ধ লিখতেন। ক্রমশঃ আলোচনা খুব গভীর হয়ে উঠ্লো। এই প্রবন্ধের অনুসরণ করে New youth (নব যৌবন)-সম্পাদক Chen Tu-seu'র 'সাহিত্য-বিপ্লব' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। সংস্কার কার্য্যের সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত 'সাহিত্য-বিপ্লব' পর্য্যায় সূচিত হ'ল। Dr. Hu Suh সুদৃঢ়-ভিত্তি গড়ে গেলেন, Chen Tu seu তা'র ওপর প্রাসাদ রচনার ভার নিলেন। আগে যে জিনিষ শুধু দু এক জনের স্বপ্ন মাত্র ছিল, ১৯১৭ সালের পর সে সর্ব্ব-সাধারণের সম্পত্তির মত পরিগণিত হ'ল। পরস্পর-বিরোধী অসংখ্য দল গড়ে উঠলো, বিষয়-বস্তুটীর সজীবতার প্রমাণ স্বরূপ। ১৯১৭ সালের জানুয়ারীতে Chen Tu Seu এক প্রবন্ধে লিখলেন,

চীনের যৌবন অভিযান

"ইউরোপ আজ এত বলবান ও গৌরবময় হয়ে উঠলো কী করে? এ হচ্চে বিপ্লবের ফল। বিপ্লব অর্থে বোঝায় পুরাতনকে পরিত্যাগ করে নূতনকে আহ্বান করা।... ...তাই সাহিত্য-'রেনেঁসাঁস্' (পুনর্জ্জন্ম) এর অব্যবহিত পরেই এলো সাহিত্য-বিপ্লব, রাজনীতির পুনর্জ্জন্মকে অনুসরণ করে এলো রাষ্ট্র-বিপ্লব; এমন কি ধর্ম্ম, নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য, শিল্প বিজ্ঞান সবই বিপ্লবের স্রোতে ভাস্‌তে লাগ্‌লো।... সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিপ্লব সমষ্টির ইতিহাস বলা যেতে পারে।...আমাদের দেশে ভীরু এবং নিরীহ ব্যক্তিরা 'বিপ্লব' নামে আঁৎকে ওঠেন; তাই রাষ্ট্রক্ষেত্রে তিন্‌টে বিপ্লব সংঘটিত হবার পরও দেশের লোক 'যে তিমিরে সে তিমিরে'।...চীনে এখন কন্‌ফুনিয়ানিস্‌ম্ এর বিরুদ্ধে অভিযান চল্‌ছে; এটা হচ্চে নৈতিক বিপ্লব-সূচনার অভাষ। সাহিত্য বিপ্লবও এখন সুরু হয়েছে; এই বিপ্লবের সৈন্যাধ্যক্ষ আমার পরম সুহৃদ Hu Suh। বন্ধুর সহায়ক হিসাবে আমি সারা চীনের বিরুদ্ধেও 'সাহিত্য-বিপ্লব-বাহিনীর পতাকা তুলে ধর্‌তে রাজি। বিপ্লবীদের তিনটী কর্ত্তব্য এই পতাকার বুকে লেখা থাকবে,

"(১) পুরাতন 'বড়লোকী' সাহিত্যকে ধ্বংস করে সর্ব্বসাধারণের সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করবো।

(২) সাহিত্যের প্রাচীনত্বকে দূর করে তাকে বাস্তব করে তুলবো।

(৩) জগৎ সমক্ষে অপরিচিত সাহিত্যকে নষ্ট করে সর্ব্ব-সমাদৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করবো !..."

আশ্চর্য্যের বিষয়, সাহিত্যের পথে অভিযানের প্রধান পাণ্ডারা সকলেই পিকিংএর জাতির বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় লোক। এঁদের দুএকজনের পরিচয় এবার দেবো। Hu Suh সাহিত্য বিপ্লবের প্রথমাবস্থায় আমেরিকায় থাকলেও একাদিক্রমে প্রবন্ধে পর প্রবন্ধ লিখে গেছেন। দেশে ফিরে এসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর একটী প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের একটী অংশ উদ্ধৃত করে দিলুম,—

"বিপ্লব যখন শুরু করি, প্রাচীন সাহিত্যের বিনাশই তখন অভিপ্রায় ছিল। এখন চিন্তার অবসর পেয়ে, সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে শুধু আঘাতে কোনও ফল নেই।...যদি সত্য সজীব সাহিত্যই চাই, মিথ্যা, মৃত সাহিত্য আপনা হতেই অন্তর্হিত হ'বে, সুতরাং, আশা করি সাহিত্য বিপ্লবীরা—ঐ জীর্ণ সাহিত্যের প্রতি অত মনযোগ দেবেন না; একথা স্মরণ রাখবেন যে,—অনতি বিলম্বেই বিরুদ্ধদলকে জয় করা হবে। এখন আমাদের সৃষ্টি সমস্যায় মাথা ঘামাতে হ'বে। ক'বছরের মধ্যেই নব্য-চীনের জীবন্ত সাহিত্যকে গড়ে তোলা চাই।"...

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবন্ধটী আন্দোলনের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। Chen Tn-Seu জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের Dean

ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'A Literary Revolution' (সাহিত্য-বিপ্লব) প্রভৃত কার্য্য করণে সক্ষম হয়েছিল।

Chion Hsuan-tung জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সাহিত্য-বিপ্লবের উৎসাহিদের মধ্যে একজন প্রধান এবং প্রথম। HuSuhকে কোন পত্রে তিনি লিখেন যে, কথ্য এবং লিখিত ভাষায় যে অসামঞ্জস্য তা'তে তিনি বিশেষ ক্ষুন্ন এবং অসন্তুষ্ট। সাহিত্য-অধ্যয়নে তিনি বৃথা সময়ব্যয় করেছেন বলে মনে করেন। সেই পত্রের একাংশে তিনি লিখেন,—

"...Ynanএর রাজ-তন্ত্র-আন্দোলনের সময় থেকে আমি উত্তেজিত হয়ে রয়েছি এবং আমার শিক্ষাও প্রচুর হয়েছে। কোনও কিছু কর্‌তে হ'লে, সব সময়ই এগিয়ে চল্‌তে হয়। যেমন, আমি একত্রিশ বছরের যুবা, আস্‌ছে বছর বয়স হবে বত্রিশ। ত্রিশ আর জীবনে হবে না!...অতীতকে আমাদের ত্যাগ কর্‌তেই হবে; আমরা হ'ব বর্ত্তমানের উপযোগী।...এখনও আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়? সাহিত্য ও নীতি-বিপ্লবের সাহায্যকল্পে আমরা কি আন্তরিকভাবে দেহ, মন নিযুক্ত কর্‌তে পারি না?..."

Chou Tso jen ছিলেন ইউরোপীয় সাহিত্যের অধ্যাপক। বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ পুস্তকের অনুবাদ তিনি করেছেন। তিনি Human Literature (মানবিক সাহিত্য) নামক প্রবন্ধে লিখেন,

"...ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ সাধারণ মনুষ্য-জীবনের

চিরন্তন অনুভূতির মধ্যে।...সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দেহ বা আত্মা কোনটাকেই প্রাধান্য দেয় না,—বলে ওটা একেরই দ্বিবিধ প্রকাশ। আমরা ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করি—কিন্তু সারা মানব জাতিকেও আমরা ভালবাসি। মানবিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে সেরকম নীতিশাস্ত্রও চাই,—যেমন, স্ত্রী, পুরুষের সমানাধিকার, স্বাধীন-প্রেম ইত্যাদি"...

Lo S. Lung ছাত্র ছিলেন। তাঁর মতে যুবকেরা অধিকাংশই ছাত্র। পুরাতনকে ধ্বংস করে নূতনকে সৃষ্টি করতে তারাই সক্ষম। তিনি লেখেন,—'আমি একজন যুবা, ছাত্রও বটে। এই দুই হওয়ার সৌভাগ্যে, আমি প্রাণবন্ত। বসন্তের সূর্য্যের মত সর্ব্বস্থলে জীবনের জাদুস্পর্শ বুলিয়ে যাবো।"

অচিরেই এই আন্দোলন পণ্ডিত এবং ছাত্র সমাজের চিত্ত আকর্ষণে সক্ষম হ'ল। আন্দোলন যখন তুমুল হয়ে উঠেছে, তখন বিভিন্ন ৪।৫টা দল সাহিত্য সমস্যায় অসম্ভব ব্যস্ত। কেউ বল্‌ছে প্রাচীন সাহিত্যের নাম গন্ধ রেখো না; কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের সম্মান দাও। অন্য এক দল বল্‌ছে ঠিক তার বিপরীত কথা—কতকগুলি মস্তিষ্কহীন বিদ্রোহীর কথা গ্রাহ্য করোনা; প্রাচীন সাহিত্যকে পূজা করো'। আবার আর দল ঠিক এদের সন্ধিপথে এসে বলছে,—'নূতন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কথ্য ভাষাই অবলম্বন হোক্, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের মূল্যবান অংশটুকু সঞ্চিত থাক্ নব সাহিত্যকে শ্রী মণ্ডিত করবার জন্য। আর এক চতুর্থ দল পূর্ব্ব-

বর্ণিত সবাইকেই আক্রমন করে বল্‌ছে, প্রাচীন সাহিত্যই থাক, কিন্তু বর্ত্তমানের উপযোগী করবার জন্য তার সংস্কার করো। আরও একটি ক্ষুদ্র দল এক অসম্ভব প্রস্তাব তুলে বললে, আন্তর্জ্জাতিক ভাষার (Esperanto) আশ্রয় নাও।

একটী সমস্যা নিয়ে বহু সংঘ সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী ফল তর্ক বিতর্ক বাদ বিসম্বাদ এবং আরো উত্তেজিত অবস্থায় গালাগালি পর্য্যন্ত হয়ে থাকে ; এ ক্ষেত্রেও হ'ল তাই। বিপ্লব-বিরোধীরা বল্‌লেন, চীনের যুবক সম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতি ঘটেছে, তাহাদের পবিত্র কন্‌ফুশিয়ানিসম্‌কে আক্রমণ করতে শিক্ষা দেওয়া হচ্চে, প্রাচীন নীতিশাস্ত্র আর ভাষাকেও তারা অবজ্ঞা কর্‌ছে। এককথায় তারা পাশ্চত্য সভ্যতাকে পূজো কর্‌তে গিয়ে—নিজেদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে আহুতি দিচ্ছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, Lin Shu ছিলেন এই সম্প্রদায়ের নেতা। LinShu ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ Mr. Tsi ynan pei'র নামে এক দৈনিক সংবাদ পত্রে চিঠি প্রকাশিত কর্‌লেন,—

"প্রিয় মিঃ Tsai,

চীনের অবস্থা এখন নিতান্ত শোচনীয়।...সবাই আজ চায়—'কন্‌ফুসিয়াস' মেন্‌সিয়ানস্‌এর শিক্ষাকে অমান্য কর্‌তে, পুরাতন নীতিশাস্ত্রকে অবজ্ঞা কর্‌তে। এই কন্‌ফুসিয়াস্‌, মেন্‌সিয়াসএর বংশধর আপনারা আজ দুরবস্থায় বিপন্ন ; নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের আশ্রয় অস্বীকার কর্‌ছেন—এমন কি পিতামাতার পর্য্যন্ত

অবাধ্য হচ্ছেন। আত্মপ্রসাদ লাভ আপনার এতে হ'তে পারে; কিন্তু এ উচিৎ কার্য্য হচ্ছে কি? পাশ্চাত্যজাতীরা আমাদের নীতি ও ধর্ম্মকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নি, উপরন্তু, আমি পূব, পশ্চিমের নীতি-শিক্ষার পার্থক্য আবিষ্কার করতে পারি না। ...এখন আমার বয়স ৭০ বছর।...প্রকৃত শিক্ষা এবং চরিত্রই আমাদের দরকার, জগৎ সমক্ষে যদি দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে চাই। আপনারা যদি পুরাতন বইগুলিকে বাতিল করে দিয়ে কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যের বাহন নিযুক্ত করেন,—তা' হলে পথের লোকে মিলে ব্যাকরণের বিধি ব্যবস্থা ব্যর্থ করে দেবে। সাহিত্য সৃষ্টিকরা মুখের কথা নয়, অনেক রসদের দরকার।...কথ্য ভাষাকে মুখ্য এবং সাহিত্যকে গৌণ করা মোটেই উচিত নয়। গুরুজনরা কনিষ্ঠদের আপনাদের আশ্রয়েই পাঠিয়েছেন, আশাকরি তাদের যত্ন নেবেন, এবং পরম্পরাগত প্রথায় তাদের মানুষ করবেন।...

ইতি

Lin Su"—

Mr. Tsai এর উত্তর দিলেন,

"প্রিয় মিঃ **Lin**,

আমাকে লেখা আপনার ১৮ তারিখের চিঠি কাগজে পড়লুম। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আপনার উৎসাহ দেখে খুব আনন্দিত হয়েছি, দুটী অভিযোগ আপনি আমাদের বিরুদ্ধে দিয়েছেন, প্রথমতঃ

আমরা কন্‌ফুসিয়াস্‌, মেনসিয়াস্‌এর শিক্ষা এবং প্রচীন নীতিশাস্ত্রকে ধ্বংস করতে মনস্থ; দ্বিতীয়তঃ আমরা প্রাচীন পুস্তকাবলী অপাঠ্য স্বরূপ করে কথ্যভাষাকে সাহিত্যের সোপান স্বরূপ অবলম্বন করে তার গঠন কার্য্যে ব্যস্ত। এদের সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায়তনের বাইরে কেউ যদি কিছু শেখায়, বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্য দায়ী নয়; এর বাইরে অধ্যাপকদের স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তার অধিকার আছে।...জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি প্রাচীন সাহিত্যকে বিতাড়িত করেছে? কিম্বা পুরোপুরি কথ্য ভাষাকে অভ্যর্থনা করেছে? মুখের এবং বইয়ের ভাষা বিভিন্ন হলেও, বক্তব্যটুকু এক। 'ডার্‌উইনের Theory of Evolution (ক্রমবিকাশ-বাদ) অধিকাংশ চলিত ভাষায় লেখা এবং Yenfu তার প্রাচিন ভাষায় অনুবাদ করেন।... আপনি কি মূল গ্রন্থটীর চেয়ে অনুবাদটীকে ভাল বলেন? হতে পারে উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি কর্‌তে গেলে প্রচুর পড়ার দরকার; কিন্তু আপনি কি করে জানলেন, হে Hushu Chien, প্রভৃতি লেখক প্রচুর পড়েন্‌ নি?... বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার দুটী মুল ধারণা আছে। প্রথতঃ, শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যলয়গুলিকে অনুসরণ করে থাকি। আমরা স্বাধীন-চিন্তার প্রশ্রয় দিই; অধ্যাপকের বিভিন্ন মত থাক্‌তে পারে; কিন্তু আমরা তাঁদের মতপ্রকাশে বাধা দিই না...দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যদি অপরের স্বাধীনচিন্তায় ব্যাঘাত না করেন—তা'হলে

বিশ্ববিদ্যালয়ের : বাইরে তাঁদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকবে '...

ইতি

Tsai yuan pei"—

Tsaiর এই উত্তরে রীতিমত সোরগোল পড়ে গেল। বক্তৃতায়, লেখায়, এই চিঠির অংশ-বিশেষ খুব উদ্ধৃত হতে লাগলো। সাহিত্যকে কেন্দ্রকরে যেমন প্রবীন, রক্ষণশীল, বিপ্লববিরোধীদের সঙ্গে তরুণ বিপ্লবীদের কলহ বাধলো ; তেমনি আর একদিকে এই তরুণদেরই অন্য একটী দল পরিপুষ্ট হয়ে উঠলো ; তাঁদেরমত, 'কথ্যভাষাকে সাহিত্যসৃষ্টির উপায় স্বরূপ করা অনুচিত ; প্রাচীন ভাষারই বিধিমত সংস্কার প্রয়োজন'। Dr. S. S. Hucকে এই দলের নেতা বলা যেতে পারে। ১৯১৯ সালে তিনি Chinese Literary Reform (চীন-সাহিত্য-সংস্কার) প্রবন্ধে লিখলেন,

"Chen Tu Seu আর Hu Suh'র সেনাপতিত্বে যখন সাহিত্য-বিপ্লব সুরু হ'ল, জনসাধারণ অন্ধের মত তাঁদের অনুসরণ করলে, এই অনুসরণকারীদের মধ্যে অনেকে বিজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট. PhD ও ছিলেন। আমার নিজের কিছু বৈশিষ্ট না থাকলেও, আমিও বিদেশী বিদ্যালয়ে পড়েছি, ইংরাজী সাহিত্য এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আমারও কিছু জ্ঞান আছে ......সাহিত্য সংস্কার সম্বন্ধে আমি স্পষ্ট আলোচনা চাই।......সাহিত্য সাহিত্যই ; ভাষা ভাষাছাড়া অন্য কিছু নয়'

ভাষার সৃষ্টি হয়েছে পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের জন্য; সাহিত্যের এ ছাড়া অন্য কিছু আছে; সেটা হচ্ছে তার অঙ্গ-বিন্যাস (Structure), এর বাক্যে, পদে নির্ম্মাণ-কৌশল আছে, কারুশিল্প আছে। যা লেখা যায় তাকেই সাহিত্য বলেনা। সাহিত্যের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে সাহিত্য বিপ্লবীরা সবচেয়ে সোজা এবং সাধারণ ভাষাকে ব্যবহার করতে চাইছেন।……এ কথা সত্য নয় যে, পাশ্চাত্য দেশে কথ্য এবং লিখিত ভাষা এক।……কাব্য রচনায় ভাব ও রস-সৌন্দর্য্য আছে।……এই সব ভেবে মনে হয় সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে কথ্য ভাষা যথেষ্ট নয়।……তাই আমার ধারণা নব-সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে প্রাচীন সাহিত্যকেই ভিত্তি করতে হ'বে। তার ভালটুকু নিয়ে বর্ত্তমানের উপযোগী করে তুল্‌তে হ'বে

একজন ছাত্র এই প্রবন্ধের উত্তর দিলে,—

"……আমি কখনও বিদেশে যাইনি, সুতরাং আশাকরি Dr Hu অনুগ্রহ করে আমার ত্রুটী মার্জ্জনা কর্ব্বেন, অবশ্য যদি কিছু ত্রুটী হয়ে থাকে……ভাষা এবং সাহিত্যের মধ্যে প্রভেদ খুবই সাধারণ এবং সোজা, এ সম্বন্ধে আলোচনা বহুকাল হয়ে গেছে। Dr Hu'র মতে সাহিত্যের জন্য রচনা কৌশল, সৌন্দর্য্য জ্ঞান, রসবোধ প্রভৃতি থাকা দরকার; কিন্তু এগুলিই কি প্রয়োজনের শেষ? এ কথা কি সত্য নয় যে, সাহিত্য চিন্তা, আদর্শ ও ভাব প্রতিফলিত করে? সাহিত্য হচ্চে জীবনের বিশদ-

ব্যাখ্যা, তার সমালোচনা,—উৎকৃষ্ট ভাব, কল্পনা আর রচনা-কৌশল প্রকাশের উপায়; যা'র মধ্যে নিত্য-সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান, যা অন্তরকে স্পর্শ করে, মানুষের গূঢ় বাসনা, ব্যর্থতা, বেদনা সব যাতে ব্যক্ত হয়। এ অতি সহজ বোধ্য যে, কথ্য ভাষাই আমাদের ভাব ও কল্পনা প্রকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। কেন? কারণ এ হচ্চে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য সাথী, জীবনের প্রতিক্ষণেই আমরা তার সাহায্য পেয়ে থাকি। কথ্য ভাষার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বও স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখা যায়। মোটের ওপর, সাহিত্যের জীবন মনুষ্য জীবনের ওপর নির্ভর করে, মনুষ্য জীবনের সেবাতেই তার সাথকতা। সুতরাং আমাদের পরিবর্ত্তনশীল জীবনের সঙ্গে সাহিত্যও বদ্‌লাতে বাধ্য।"—

এমনি করে দুই বিভিন্ন তরুণদলে মতদ্বৈধ হ'ল। পিকিং কেন্দ্রের বিপ্লবীরা প্রাচীন সাহিত্যকে ভেঙ্গেচুরে ফেল্‌তে চায় আর নানকিং কেন্দ্রের তরুণরা পুরাতনকেই সংস্কার করে আধুনিকোপযোগী করতে চায়। মত বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এদের এক, সাহিত্যকে দেশের কল্যানকর হিসাবে গড়ে তোলা, জাতি-সৃষ্টির উপাদান রূপে মান্য করা। দু'দলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান জীবনধারাকে সমালোচকের সুক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌তে চায়। উভয়েরই উদ্দেশ্য নব সাহিত্য, নব সভ্যতার সৃষ্টি করা।

সাহিত্য নিয়ে এই বিরাট আন্দোলনের ফলে কথ্য ভাষার

স্থান পুঁথি, পুস্তকে প্রধান হয়ে উঠ্‌লো, জনসাধারণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লে, ভাবপ্রকাশের সহজ উপায় তাদের হয়েছে। কিছু দিন পূর্ব্বে, পুত্র পিতাকে-লিখিত-পত্রে যদি দু'একটী কথ্য ভাষার ব্যবহার করতো, তাহলে পিতা, ক্ষুন্ন ও লজ্জিত হতেন, কিন্তু আজ আগাগোড়া কথ্য ভাষায় পত্রে পিতা আনন্দ ও গর্ব্বে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

কথ্য ভাষায় সৃষ্ট নব-সাহিত্য এত জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌লো যে, ১৯১৯ সালের সাহিত্য-বিপ্লব সুরু হওয়ার ৪ বছরের মধ্যেই এ ভাষায় ছাত্রদের মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক তিনশ' পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল। বাংলার ছাত্র-সম্প্রদায় বোধ হয় এ সংখ্যা দেখে বিস্মিত হ'বেন কারণ নিজস্ব বলে তাঁদের যা' সাময়িক সাহিত্য আছে তা'কে অনায়াসে নগণ্য বলা যেতে পারে। আমাদের দেশের ছাত্র-সমাজ গতিশীল নয়, বিপ্লব-প্রচেষ্টা বা আন্দোলন আমাদের দেশেও অল্প হয়নি কিন্তু তরুণ সদম্প্রায় এখনও নির্জীব, সুপ্তির আলস্য কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেনি। তরুণের এতবড় দৈন্যের কারণ বহুল, বিশ্বাসকম্নি; কিন্তু দৈন্য কোনও কালেই চিরন্তন হয়না, ব্যর্থ-বিলাসের বেড়াজাল ভেঙ্গে দৈন্যকে বিফল করে দেওয়াই আত্ম-প্রবুদ্ধ যৌবনের ধর্ম্ম। যৌবন-অভিযান বিলাসী তরুণের বিলাস-বাসনা নয়, ত্যাগী তরুণের আত্মোন্নতির পথে জয়-যাত্রা। চীনের যৌবন-অভিযানের পথে অনুপযুক্ত, অসংস্কৃত সাহিত্য পড়েছিল, তার সংস্কার কার্য্যে তরুণসম্প্রদায় উৎসাহিত

হয়ে উঠ্‌লো, কার্য্য-ক্ষেত্রে সফল হতেও তাদের বিলম্ব হ'ল না! কথ্য ভাষার সহজ-সূত্রে যৌবন-অভিযাত্রীরা জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত হল।

—সাত—

কত শত যুগ পিছনে তোমার পড়ে'— মিলন মিথ্যা, দ্বন্দই হলো সার ?
তুমি সুসভ্য, বোঝ বিশ্বের-বাণী ! বোমাবারুদের বিপুল-বিলাসে ভোলো ?
আজো কেন ভাই ভাইয়ের দ্বন্দ ওরে ? দেহ-দম্ভত' সব নহে দুনিরার,
পশ্চিমহাসে পুবের পরাণ হানি ? সময় হয়েছে অন্তরদ্বার খোলো !!

অনেকের মতে বর্ত্তমান-সভ্যতা মানব-জাতিকে উন্নতির শীর্ষ-সোপানে উঠিয়েছে, মানব-বুদ্ধিকে অসম্ভব তীক্ষ্ণ করেছে, সারা জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ বাড়িয়েছে ; কিন্তু অন্যদিকে তা'কে করেছে কূটীল, স্বার্থান্বেষী। এই সভ্যতাই তথাকথিত সভ্য জাতিদের মুখোস্ জুগিয়েছে, যা'র অন্তরালে স্বার্থপিশাচ পশুর অন্তর নির্বিঘ্নে পুষ্ট হচ্চে। তাই তাঁরা বলেন, এ হেন জগতে আন্তর্জ্জাতিকতা বিশ্বমানবতা ফাঁকা কথা, সুদখোরের পরার্থে-দানের মত অবাস্তব। যতদিন পরপদানত, বিদেশীর বিষম-শাসনে নিষ্পিষ্ট, ততদিনই আন্তর্জ্জাতিকতা বা বিশ্বমানবতার কথা মনে জাগে ; স্বাধীন হলেই এসব সচ্চিন্তা মনের বা কাজের গণ্ডীর বাইরে চলে যায়। এই সভ্যতা-প্রদত্ত মুখোস বিগত মহাযুদ্ধের সময় সব জাতির মুখ হতে খসে গেলো। পশুর হিংস্রতা ফুটে উঠ্লো, সমরানলে হ'ল তার পরিতৃপ্তি। কলহক্লান্ত জাতিরা Paris'এ সমবেত হলো পৃথিবীতে

শান্তির প্রতিষ্ঠা কর্‌তে। তখন চীনেরও মুখে হাসি, বুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

জাপান অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে গত যুদ্ধের সুযোগে চীনের Shantung প্রদেশ অধিকার করে বস্‌লো। চীনের ক্ষীণআপত্তি তারা অনায়াসে অগ্রাহ্য করলে। অনন্যোপায় চীন Peace Conference (শান্তি বৈঠক) এর মুখ চেয়ে বসে রইলো। ১৯১৯ সালের ৩০শে এপ্রিলে সিদ্ধান্ত হ'ল, জাপানই Shantung এ আধিপত্য কর্‌বে! আশার লতাটি নিষ্ঠুর পায়ের তলায় নির্য্যাতিত হয়ে মরে গেল! তখন চীনের আর বুঝতে বাকি রইলনা যে, এরা সব 'মাসতুতো ভাই'।

দেখতে দেখতে দুটো সংঘ গড়ে উঠ্‌লো; একদল পৃথিবীর সমক্ষে জানালে যে, ইউরোপের বিভিন্ন জাতির প্রতিকূল সিদ্ধান্ত আর তাদের ভণ্ড মিত্রতা তারা মানতে রাজী নয়, আর একদল Chamber of Commerce (বাণিজ্য-সংসদ) কে জাপানী-দ্রব্য 'বয়কট' করবার জন্য অনুরোধ করলে। ছাত্রসম্প্রদায় তখন খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে;—জাপান তাদের নিকট-প্রতিবেশী হয়েও অকারণে তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করবে? এ যেন তাদের অসহ্য! একজন ছাত্র সে সময়ের বর্ণনা দিয়ে বলেন—

"আমি তখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। তখন আমরা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছি। কারণ অনেকখানি আশা নিয়ে হতাশ হতে হয়েছে।

Armistice'র সময়ও আমরা খুব আশান্বিত ছিলুম্। ভাবলুম্ জগতের সব জাতের এবার রীতিমত শিক্ষা হয়ে গেল। ১৯১৮ সালের ৩০শে নবেম্বর ছাত্রদের এক বিরাট সভাও হ'ল ; আলোচ্য বিষয় ছিল "Anti-militarism" (সমরপ্রিয়তার বিরোধিতা)। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসের "The Renaissance" লিখ্‌লে 'জগত যদি আজ সমর-প্রিয়তা ত্যাগ না করে, তা'হলে চীনই জগতের পথপ্রদর্শক হবে।' কিন্তু প্যারীসের "শান্তি বৈঠকে"র মতামত প্রকাশিত হ'বার পর আমরা সব হতভম্ব হয়ে গেলুম্! তখন আর বুঝতে বাকী রইল না যে, ও সব জগত অদ্যাপি স্বার্থপর, সমরপ্রিয় আর মিথ্যাবাদী। আমার মনে আছে ২রা মে আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি। সারা রাত কথাবর্ত্তায় কেটে গেছে। আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম্ যে, আরও বড় আরও প্রচণ্ড যুদ্ধ ভবিষ্যতের গর্ভে পুষ্ট হচ্ছে, আর সে যুদ্ধের 'কুরুক্ষেত্র' হবে এই প্রাচী,...Woodrow Wilson'র মত প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে কোনও লাভ নেই, এ কথা বেশ বুঝেছি। নিজেদের অবস্থা দেখে, আর নিরক্ষর, দীন জনসাধারণকে দেখে এই কথাই তখন মনে হ'ল যে. বাঁচ্‌তে গেলে আমাদের লড়তে হবে ;—যুদ্ধ করতে হ'বে—"

জাপান আইন-বিরুদ্ধ কাজ করতে সক্ষম হয়েছিল শুধু তার পরাক্রমের প্রসাদে ; কিন্তু চীনের যুবজন এত বড় অন্যায় বরদাস্ত করতে পারলে না ; ভায়ানক চঞ্চল হয়ে উঠলো! বিখ্যাত ৪ঠা

মে তারিখের ছাত্রদের বিরাট সামরিক শোভাযাত্রা সেই চঞ্চলতার ফল। একটি ছাত্রের রচনা হ'তে সেই বিরাট ব্যাপারের বর্ণণা দেওয়া গেল—

"১৯১৯ সালের ৩রা মে একটি বিরাট সভা আহুত হয়। এক হাজারেরও অধিক ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিল।...দুর্দ্দশাপন্ন জাতীয় সমস্যায় আলোচনা হ'ল। সবাই এ সম্বন্ধে এক মত হলুম যে, Shantung সমস্যার মূলে রয়েছে অন্যায় অত্যাচার! ছাত্রসম্প্রদায়কে শক্তিদ্বারাও প্রমাণ করতে হবে যে, পশুশক্তি কখনও ন্যায় নয়।...কার্য্যপন্থাকে ৪ ভাগে ভাগ করা হ'ল:—(১) দেশের সমস্ত শক্তিকে সংহত করতে হবে। (২) প্যারিসে Peace Confernce'এ (শান্তিসভায়) চীনা প্রতিনিধিগণকে অসহযোগ করতে তার (Telegraph) করে দেওয়া হোক্। (৩) চীনের বিভিন্ন বিভাগে ৭ই মে, "National Humiliation Day"তে (জাতীয় অপমান-দিবসে) সামরিক শোভাযাত্রার বন্দোবস্ত করবার জন্য তাদের ব্যবস্থা হোক্। (৪) আগামী ৪ঠা তারিখে পিকিং'র ছাত্রদের অসন্তোষ জ্ঞাপনার্থে যথোচিত আয়োজন হোক্।...

"এই সভায় Law School'র ছাত্র Mr. Tshia নিজের আঙ্গুল কেটে রক্তাক্ষরে দেয়ালে লিখলেন, 'আমাদের Tsing-tao ফিরিয়ে দাও!' আমরা তখন সবাই নিস্তব্ধ, নিঝুম!

"পুস্তিকার সাহায্যে আমরা এই সভার উদ্দেশ্য এবং আদর্শের

বাণী প্রচার করলুম। তাদেরই পাতায় আমাদের দাবী সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলো,—'আমরা চাই ধর্ম্ম, ন্যায় ও বিবেকের আধিপত্য। অত্যাচারী রাজন্যবর্গের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান!'...

"শিক্ষা-সমিতির অনুনয় অগ্রাহ্য করে আমরা সহস্রাধিক ছাত্র মার্চ্চ করে পথে বেরিয়ে পড়লুম!...পথে পড়লো এক বিশ্বাসঘাতক 'মির্জ্জাফরে'র বাড়ী। তার বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখি পুলিশ আর সৈন্য প্রহরী নিযুক্ত হয়েছে! হঠাৎ দরজা খুলে যাওয়াতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়া গেল; নরাধম বিশ্বাসঘাতক জনকয়েক জাপানীর সঙ্গে তখন মন্ত্রনায় ব্যস্ত।...তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলো! হটাৎ দেখি বাড়ীটায় আগুন লেগে গেছে—সৈন্যেরা গুলি চালিয়েছে।...তখন আমাদের মধ্যে ৩২ জন বন্দী।...পুলিশ তাদের পথে bayonate'র খোঁচা মারতে মারতে আর চপেটাঘাত করতে করতে থানায় নিয়ে চললো। তাদের দল বেঁধে, চোর ডাকাতের সঙ্গে বন্দী করে রাখলে।...কথা পর্য্যন্ত বন্ধ হ'ল!"—

চীন সরকার ছাত্র সম্প্রদায়ের এই Demonstrationএ শঙ্কিত হয়ে উঠলো; আর তার কূট বুদ্ধির সাহায্যে এই Demonstration'র অজুহাতেই পিকিং'এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে,—বহুকালের সঞ্চিত ক্রোধ সুযোগ বুঝে মূর্ত্ত হয়ে উঠলো! পূর্ব্বে যখন এই তরুণ সম্প্রদায় 'পবিত্র-কনফুসিয়ানিসম্,' প্রাচীন রাজভাষা, আর সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে খড়্গা তুলে ধরেছিল, তখন চীন সরকার সুবিধা মত তির-

স্কার করতে সক্ষম হয় নি ;।এবার সে যথার্থ সুযোগ পেলে—শিক্ষা-সচিব কর্ম্ম-চ্যুত হলেন। রুষ্ট সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংস-সাধনে এবং Chancellor Dr. Tsaiyuan-pei'র গোপন প্রাণ সংহারে সচেষ্ট রইলেন।

সরকারের সঙ্গে ছাত্র সম্প্রদায়ের কলহ তুমুল হয়েই বাধলো। ছাত্রদের অস্ত্র হ'ল নিরুপদ্রব ধর্ম্মঘট, নিরস্ত্র বিরোধিতা, আর অসীম ধৈর্য্য, আর সরকার পশুশক্তির আশ্রয়ে, ধরপাকড়, মারধর সামরিক আইন কানুন পুরোদমে চালাতে লাগলো! Dr. Tsai-yuan-pie এই আন্দোলনকে 'জলপ্লাবন এবং বন্য-পশুর যুদ্ধ' এই আখ্যা দিয়েছেন। জাগ্রত যুবজন হ'ল প্রবল সাগরের বন্যা, বন্যপশু হ'ল চীন গবর্ণমেণ্ট!

সেই ৩২ জন ছাত্র বন্দী হওয়ার পর দেশের উত্তেজিত আবা-হাওয়াতেই আবার স্কুল বস্‌লো! কিন্তু চাঞ্চল্য তখন আরো বেড়ে গেছে ; বন্দী ভায়েদের সংবাদের জন্য তারা তখন ভয়ানক ব্যাকুল। জনৈক ছাত্রের ডায়েরী থেকে সে সময়ের ইতিহাস দিচ্ছি :—

"৪ঠা মে সন্ধ্যায় স্কুলে ফিরে এসে—'নাম ডাকা'র পরে বুঝলুম জনকয়েক সহপাঠীর সন্ধান মিল্‌ছে না। বন্দী বন্ধুদের কথা তখনই মনে হ'ল। তখনই এক সভা আহ্বান করে সভাপতি Tsai yuan-pei কে বোঝান গেল যে, পুলিশের অত্যাচারে আর বিশ্বাসঘাতকের নির্ম্মমতায় হয়ত আমাদের সুহৃদ্বর্গের অমঙ্গল ঘটে

থাকৃতে পারে ; দল বেঁধে আমাদের থানায় যাওয়া উচিত। তিনি আমাদের প্রকৃতস্থ হতে বলে, নিজেই থানায় গেলেন।

"পরদিন মস্ত বড় সভা হ'ল ; তিন হাজারেরও অধিক ছাত্র তাতে উপস্থিত ছিলো। প্রস্তাব করা হলো যে, বন্দী ছাত্রদের মুক্তি চাই আর বিশ্বাসঘাতকদের যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা চাই। আর এও ঠিক হ'ল যে, বন্দী বন্ধুরা মুক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত সব ছাত্র পাঠে বিরত থাকৃবে।"

"পিকিং'এর সংবাদ সারা চীনে পরিব্যাপ্ত হ'ল।...পরদিন প্রত্যুষে **Tsing-Hua** কলেজের বিভিন্ন সংঘ, সমিতির সদস্যরা তদন্তে এলেন। সন্ধ্যায় তাঁরা ফিরিলেন ; তাঁরা ৬০০ জন এই এই আন্দোলনে যোগদানে ঔৎসুক্য জানিয়ে গেলেন।"—

এ আন্দোলনের সহানুভূতি শুধু যে ছাত্র সম্প্রদায়ের কাছ হতেই এসেছিল তা' নয় ; দেশের বিভিন্ন সাহিত্য-সংঘ, পণ্ডিত এবং ব্যবসায়ীরাও সহানুভূতি প্রকাশে কার্পণ্য করেন নি। **Shanghai Daily News Union** নিম্নলিখিত **Telegram** (তার) করেছিলেন, (সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে)

"মাননীয় সভাপতি এবং মন্ত্রী মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

পিকিং-ছাত্রদের ব্যবহার বিপ্লবপূর্ণ হলেও—তাদের আন্তরিক স্বদেশ-ভক্তি এই আন্দোলনে প্রকট হয়ে উঠেছে। সেদিন

আমরা খবর পেলুম যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে ভেঙ্গে দেওয়া হবে, আর ছাত্রদের হত্যা করা হবে! এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে—জনসাধারণ ক্ষেপে গেছে! স্মরণ রাখবেন—অত্যাচার উত্তেজনাকে আরো ভয়ানক করে তোলে! দেশের সমস্যা এখন জীবন-মরণের;—আমাদের পশ্চাতে অসংখ্য জনসাধারণই আমাদের ক্ষমতা। এদের মত অগ্রাহ্য করবার মত দুঃসাহস করবেন না! ...আশাকরি বন্দী ছাত্রদের অচিরেই মুক্তি দিয়ে সাধারণের মানসিক উত্তেজনা নিবৃত্তির সাহায্য কর্‌বেন।"—

আর এক জায়গা হতে নিম্নলিখিত 'তার'টী এসেছিল,

"পিকিং'এর বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা-কেন্দ্রের ছাত্র-গণের প্রতি—

বন্ধুগণ,

জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে আপনাদের বীরোচিত যুদ্ধে আমরা আনন্দিত। আপনাদের আন্তরিক দেশ-ভক্তির জন্য আপনারা আমাদের সম্মানার্হ। আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আমরা সদাই প্রস্তুত।"—তন্দ্রামুক্ত জন-সমাজে কর্ম্মস্পৃহা জাগরিত হ'ল। অন্তরের ভস্মঢাকা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ইন্ধন সংযোগ কর্‌লে চীনের যুব-জন। সে নিরলস কর্ম্মবহ্নি আজও নিভে নি।

আমাদের দেশে আজও ছাত্রদের রাজনীতি থেকে তফাতে থাকৃতে উপদেশ দেওয়া হয়, যেন জাতীয় জীবনের স্পন্দনটুকুও

এদের অনুভবযোগ্য নয়। পরাধীন জাতির পঙ্কিল রাষ্ট্রশক্তি দেশকে অবনতির পাতালে নামিয়ে নিয়ে গেলেও দেশের প্রকৃত আশাসমষ্টির সে সম্বন্ধে বলবার বা করবার কিছু নেই কারণ তারা বাণীর সাধনা করে,—তারা ছাত্র! এত বড় অর্থহীন যুক্তি বোধহয় আমাদের এই 'ন্যায়রত্ন'-সমাকীর্ণ দেশেই সম্ভব? কিন্তু চীনে জাতীয় জীবনে জাগরণের জোয়ার এনেছিল ছাত্র সম্প্রদায়ই। কর্ম্মপথে তারা জনসাধারণের সহানুভূতিতে উৎসাহিত হ'ল। চীন সরকার ছাত্র আন্দোলন দমনের প্রথম প্রয়াসে ৩২ জনকে বন্দী করলে। কিন্তু প্রবল জনমতের ধাক্কা সাম্‌লাতে না পেরে ৭ই মে তারিখে তাদের মুক্তি দিলে। পিকিং'এর নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষকগণ এদের জামিন পর্য্যন্ত হ'তে চেয়েছিলেন!

প্রকৃত আন্দোলন কখনও প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, বিনাদ্বিধায় সে নিজেকে বিস্তৃত করে। জাপান-প্রবাসী চীনাছাত্রের বুকেও আন্দোলনের হাওয়া এসে বাজলো; তারাও নির্ভয়ে কর্ত্তব্য পথে পা দিলে। এদেরই দলভুক্ত একজন ছাত্র লিখেছিল,

"পশ্চাত্যজাতিদের এবং জাপানের সমরপ্রিয়তায় আমরা খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম্। তাদের এ হীন আদর্শে অসন্তোষ জ্ঞাপনার্থে ৭ই মে আমরা এক বিরাট সভা আহ্বান করলুম্।...সভার উপযুক্ত স্থান খুঁজে হায়রাণ হয়ে গেলুম্—জাপানী-পুলিস্ আমাদের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর।...অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে চীন-দূতাবাসের

প্রাঙ্গনেই সভার স্থান স্থির করা গেল।...৬ই মের সন্ধ্যা থেকেই জাপানী পুলিস দূতাবাস ঘিরে ফেলেছে, যেন তারা কোন প্রবল শত্রুর অপেক্ষায় রয়েছে।

পুলিসের বাধাপ্রদানে ৬ই সভা করা অসম্ভব বরে উঠলো, তখন ঠিক্ হ'ল যে, বিভিন্ন দলহয়ে আমরা জার্ম্মাণ দূতাবাসে সমবেত হব ; আর সেখান হ'তে রাজপথে নামবো Parade করে। "সামিরকতার ধ্বংসকরো" "শান্তি সংরক্ষণে ব্রতী হও" "আমাদের Tsung Toa ফিরিয়ে দাও" এই সব আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল।...পুলিস এসব বরদাস্ত করতে পারলেনা। কয়েকশ' ঘোড়সওয়ার সমস্ত দলটীকে ঘিরে ফেল্লে, মারামারি সুরু হ'ল,—শতাধিক ছাত্র আহত হয়েছিল এদিকে চীনের অবস্থা তখন গুরুতর। গুপ্ত-ঘাতকের হাতে প্রাণ দেওয়ার আশঙ্কায় Dr. Tsai Yuan pei ভাইস্চ্যান্সেলারের কাজে ইস্তফা দিলেন এই বলে,—আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের দরকার। সভাপতিত্বে ইস্তফা দিয়েছি। আশা করি আমাকে যাঁরা চেনেন তাঁর ক্ষমা করবেন।" শিক্ষাসচিব Mr. Fu. ও তাঁকে অনুসরণ করলেন ; বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও কর্ম্মত্যাগ করলেন। সারা চীন আতঙ্কে শিউরে উঠ্লো। তারের পর তার গিয়ে গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করে তুল্লে, সবাই চায় সে এ সমস্যার বিবেচনা করুক্। অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে

উঠলো ছজন ছাত্রের আত্মহত্যার পর! এদের মধ্যে একজন জলে ডুবে মরেছিল। তার পোষাকে এই লেখাটুকু ছিল।

"এত বহিরাক্রমণ এবং অন্তর্বিপ্লবে চীন বেশীদিন বাঁচতে পারে না। কেউ বলতে পারে না কবে Shantung সমস্যার মিমাংসা হ'বে, কবেইবা উত্তর, দক্ষিণে বন্ধুত্ব হ'বে। নিস্বার্থ ছাত্রসম্প্রদায়ের দেশের মুক্তির জন্য নিরস্ত্র যুদ্ধের দৃশ্য অতীব করুণ! একটা জাতিকে পৃথিবীর বুক হতে লুপ্ত হ'তে দেখার চেয়ে, তার দাসত্ব-বন্ধন প্রত্যক্ষ করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ; জীবিত-দাস হওয়ার চেয়ে মুক্ত-প্রেত হওয়ায় সার্থকতা আছে। প্রিয় বন্ধুগণ; বীরের মত দেশের জন্য যুদ্ধকর। আমার জীবনের পরিসমাপ্তি হ'ল"।—

মানসিক দুর্ভাবনায় ম্রিয়মান ছাত্রটীর জীবন-নাট্যে যবনিকা পড়ে গেল। আত্মীয় বন্ধু হয়ত নির্জ্জনে দুফোঁটা অশ্রু ফেল্‌লে, হয়তো বা ফেল্‌লে না, কিন্তু একটী ক্ষুধিত আত্মা চীনের ভাগ্যাকাশে অরুণোদয় দেখবার জন্য প্রতীক্ষায় রইলো।

৩২জন বন্দীছাত্রকে মুক্তি দিলেও, সরকার দমননীতি ত্যাগ করে নি; জনসাধারণের দাবী-সম্বন্ধে সম্পুর্ণ উদাসীন থেকে সরকার পুরোদমেই দমন-নীতি চালালে। ফলে, চীনের সমস্ত ছাত্র ধর্ম্মঘট করলে। ইস্কুলের বাঁধা 'রুটিন্ (Routine) অভিনব ব্যস্ততায় কোথায় তলিয়ে গেল। একজনের রচনায় তার নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে।

"ছাত্র আন্দোলন যখন সুরু হয় তখন আমি Foochow'র Fukein বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্র। ১৯১৯ সালের মে'র শেষাশেষি—সারা সহর ধর্ম্মঘট করলে; সব ছাত্রই তখন ব্যস্ত, কেউ সাদা নিশান রচনায় নিযুক্ত, কেউ নিবেদন ছাপাতে ব্যস্ত। কেউবা প্রোপাগাণ্ডা'র জন্য সাহিত্য রচনা কচ্ছে।... 'বয় স্কাউট্'রা ছাত্র-পুলিস্-স্বরূপ বিদ্যালয়ের প্রহরায় নিযুক্ত হল। কঠোর পরিশ্রমেও কেউ লেগে গেল।...সবারের কণ্ঠে তখন গান। তরুণের এ অভূতপূর্ব্ব-কর্ম্মোদ্যমে চীন সরকার শঙ্কিত হয়ে--কিঞ্চিৎ ত্যাগে স্বীকৃত হ'ল; কিন্তু যেই "৭ই মে" নামে দৈনিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হ'ল, আর তার রচনায় মুগ্ধ হয়ে গাড়োয়ানরা পর্য্যন্ত তাকে পড়তে সুরু করলে তখন সরকার সেই কাগজকে বন্ধ করতে বাধ্য হ'ল; ছাত্র-সম্পাদকও ধৃত হ'ল।...ত্যাগের ইচ্ছা এক নিমেষেই কর্পূরের মত উঠে গেল!

Professor John Dewey সে সময়ে চীনে ছিলেন। তিনি লেখেন, "এইমাত্র দেখলুম কয়েকশ' "American Board Mission" স্কুলের ছাত্রী 'প্রেসিডেন্টে'র কাছে চলেছে তাদের যে সব ছাত্র বন্ধুরা বর্ত্তৃতাকালে বন্দী হয়েছিল তাদের মুক্তিভিক্ষার জন্য। চীনের জীবন এখন উত্তেজিত, একথা বল্লে সত্য কথাই বলা হয়, এক জাতির জন্ম আমরা প্রত্যক্ষ করছি,—জন্ম অনেক দুঃখ, কষ্টের মধ্য দিয়েই হয়। সে ইতিহাসের সুরু থেকেই আমি বর্ণনা দিতে পারি; কিন্তু পরবর্ত্তী দ্রুততাল

রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাল আমরা পশ্চিম-পর্ব্বতের ওপর মন্দির দর্শনে গেছলুম; ফেরার পথে দেখি ছাত্রেরা জনসাধারণের সভায় বর্ত্তৃতা দিচ্ছে, এ ব্যাপার তাদের ইতিহাসে সেই প্রথম... আজকের কাগজে সে সব খবর ছাড়া অন্য কিছু নেই। সব চেয়ে বিশ্রী কাণ্ড এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে জেলখানায়,—চারিদিকে পুলিসের তাঁবু।...শুন্‌তে পেলুম দুশ ছাত্র বন্দী থাকা সত্বেও, দুজনকে পুলিশের ঘরে বেত মারা হয়েছে, এদের অপরাধ বর্ত্তৃতা করা। এরা নাকি পুলিসদের প্রশ্নকরে অপ্রস্তুত করে তুলেছিল; তারই ফলে এই বেত্রাঘাত! এই আজ সকালে আবার ছাত্রদের বর্ত্তৃতা দিতে দেখে এলুম—শুন্‌লুম তারাও বন্দী হয়েছে।... ছাত্রীদের এই অভিযান কর্ত্তৃপক্ষের চোখে খুবই বিষদৃশ ঠেকেছিল; তারা অতটা পথ অতিক্রম করে সভাপতির বাড়ী যাবে, 'প্রেসিডেন্ট' দেখা না করলে তারা সারা দিনরাত দুয়ারে ধন্না দেবে। লোকে এদের জন্য খাবার নিয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। যারা ধরা পড়েছে, বেলা নটা পর্য্যন্ত তারা কিছু খেতে পায়নি। জেলখানায় খাবার জল আছে আর শোবার মেঝে আছে,—সেইযেন যথেষ্ট!

প্রপীড়িত দেশের সেবকেরা অশেষ লাঞ্ছনা পেয়ে থাকেন। শৃঙ্খলিতা দেশমাতৃকার মুক্তি-চেষ্টায় লক্ষকোটী নরনারী পশুশক্তির রক্তাক্ত বেদীতে জীবন দিয়েছে আজও দিচ্ছে। এই সেদিন আয়র্ল্যাণ্ড, রুশিয়ার কত সহস্র

সন্তান-মাতৃমুক্তি যজ্ঞে জীবনাহুতি দিয়েছে, চীনেও তার পুনরভিনয় হচ্চে। ইংরাজ-শাসিত, বিলাস-নেশাগ্রস্ত এই ভারতেও দেশসেবকের আত্মাহুতি বিরল নয়; এই বাংলার আঁচল চাপা ছেলেরাও মুক্তিমন্ত্রকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে জীবনকে তুচ্ছ করেছে। এই বাংলায় গত 'অগ্নিযুগে' পুলিস নৃশংসতার চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। বন্দী যুবকদের স্বীকারোক্তি (confession) করাবার জন্য অশেষবিধ নির্য্যাতন করেছে, যার ফলে এমনকি, ২২ বছরের সুপুরুষ বলিষ্ঠ যুবা এক বছরের মধ্যই শ্রীহীণ জীর্ণ পঙ্গুতে পরিণত হয়েছে। নির্য্যাতন লাঞ্ছনা মাতৃপূজারীদের ললাটের টীকা,—সাধনার অগ্নিপরীক্ষা।

চীনে ছাত্রদের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের লড়াই তুমুল হয়েই বাধলো। সরকার গায়ের জোরে শিক্ষায়তন গুলিকে জেলখানায় পরিণত করলে; বিদ্যার্থীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোহার গারদের পিছনে বিদ্রোহীর কঠোর-প্রতিশোধ-শপথে পরিণত হ'ল। পিকিংএর ছাত্ররা দেশবাসীর নিকট নিবেদন জানালে,

"গর্ণমেণ্টে কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর! জনকতক রাজকর্ম্মচারী এবং সামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সাধারণতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনে সচেষ্ট, বিশ্বাস ঘাতক তারা জাতির ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দিতে বসেছে। দেশের দীর্ঘজীবন-কামনায় এদের উচ্ছেদসাধন কর্ত্তে হ'বে,—জাতির উদ্যানে এরা আগাছা"।

জীবন পণকরে সত্যের সন্ধান করবো, এই হ'ল

চীনাযুবকের মূলমন্ত্র। পিকিংএর ছাত্রদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রসম্প্রদায় অনুপ্রাণিত হ'ল, তারাও অত্যাচারী শাসক দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, এমন ব্যপার হলযে, ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যায়; ধনিক এবং বনিক সম্প্রদায় সরকারের এ আচরণে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হয়ে উপদেশের সুরে খুব ভৎর্সনা করে নিলে। অবশেষে অনন্যোপায় গবর্ণমেণ্ট ৬ই জুন তারিখে ছাত্রদের মুক্তি দিলে।

চীনের জীবনে সে এক মহোৎসব! বন্ধনমুক্ত সন্তানের জয়োল্লাসে চীনের দেহ আনন্দে নেচে উঠ্‌লো! সর্ব্বত্রই অনাবিল আনন্দের উচ্ছ্বাস। সবাই চীৎকার করে বল্‌ছে, "চীনের প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক্!" "ছাত্রসম্প্রদায় দীর্ঘজীবী হোক্" "পিকিং'এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বেঁচে থাকুক!"—

বিজয়-বার্ত্তা যখন আসে, হৃদয়ের মূলকে নাড়া দিয়ে আসে। বিজিত-সংগ্রামের সে সার্থক সাক্ষী। সংবাদ এলো, তিন জন তথাকথিত বিশ্বাসঘাতক্ বিতাড়িত হয়েছে, শাসন পরিষদের সংস্কার হয়েছে, আর 'শান্তি বৈঠকে' চীনা প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেন্ নি। জনমতের অত বড় জয় চীনে অভূতপূর্ব্ব। John Dewey লিখেছেন,—"চীনের 'শান্তি বৈঠকে' স্বাক্ষর না করার উপকারিতা অমূল্য। সরকার পুরোপুরি স্বাক্ষর করার স্বপক্ষে—'প্রেসিডেণ্ট' (সভাপতি) দশ দিন আগে পর্য্যন্ত বলেছেন, 'এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না'। জনমতের জয়

হ'ল; আর এই জনমতের মূলে ছিলো স্কুলের বালক বালিকারা।

১৯২০ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে নিম্নলিখিত আবেদনপত্রটি চীন-প্রবাসী বিদেশীদের নিকট পাঠান হ'ল,

"........গ্রেট্‌ব্রিটেন আমেরিকা এবং ফ্রান্সের বন্ধুগণ! আপনাদের মুক্তিপত্র MagnaCharta আছে, স্বাধীনতার-বাণী Declaration of Independence আছে, সুচির-বিস্ময় French Revolution (ফরাসী-বিপ্লব) আছে; স্বাধীনতার জন্য আপনারা যুদ্ধ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন; প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কল্পে আপনারা জীবনোৎসর্গ করেছেন, আপনারা কি চান আমরা স্বৈরশাসনে দু'মিনিটের চাপে বিলুপ্ত হ'ব? আপনাদের সাহায্য পেতে পারি না? শুধু আমরা সহানুভূতি চাই। আমাদের জন্যও বটে। আটলান্টিকের কূলে আপনারা যা' করেছেন, প্রশান্তমহাসাগরের উপকূলে আমরা তাই করবো যদিও আপনাদের তুলনায় আমাদের শক্তি অল্প।"

সামরিকতার বিরুদ্ধে চীনের যৌবন অভিযান সার্থক হ'ল,মেঘ্‌লা দিনের মরা-বেলা আবার আলোর সাড়ায় জীবন্ত হয়ে উঠ্‌লো। কত হাজার বছরের সভ্যতাকে ব্যর্থ করা এই কামড়া-কামড়ির প্রতিবাদ হ'ল। স্বার্থের মোহে আত্ম-বিস্মৃত হলে চলবে না। সেই সভ্যতার সন্ধান করো যার মূলেআছে সাম্য—শান্তি।

—আট—

ধর্ম্ম ধনীর, অস্ত্র সে শোষকের,
মিথ্যা দেখায় মুক্তির মরীচিকা ;
শিকল পরায় পায়ে সে মুক্তদের
ছবি না রচিয়া রচে শুধু বিভীষিকা

ভণ্ড-ধর্ম্ম যাক্‌না নরকে মরে ?
হীন-প্রতারণা প্রলয়ে পড়ুক চাপা ?
শুক্‌নো জীর্ণ মাকাল যাক্‌না ঝরে ?
ধুলায় গড়াক্ শঠ, ভূয়ো পচা, ফাঁপা ?

সাম্রাজ্যবাদীরা ধর্ম্মের ব্যবসা করে থাকেন ; সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যবসা নয়, এ ব্যবসার স্বার্থ অতীব হীন। কোনও দেশ, যত পুরাতনই তার সভ্যতা হোক্‌না কেন পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে সমান তালে চল্‌তে পারে নি বলে অসভ্য নামে অভিহিত হয়ে থাকে। স্বার্থ-সর্ব্বস্ব 'সভ্য'-জাতির 'সু'নজর তখন এই অভাগা দেশে পড়ে। পাশ্চাত্য-ধর্ম্ম-প্রচারকরা দিব্যচক্ষে দেখতে পান যে, তাঁরা ছাড়া আর সবাই অজ্ঞতার অন্ধকারে ভূত হয়ে রয়েছে আর তাদের জ্ঞানের আলোকে মানুষ করে তোলার গুরুভার স্বচ্ছন্দে নিজেদের স্কন্ধে তাঁরা নেন্—এত তাদের করুণা ! এ করুণা তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়, কৃত্রিম-করুণা পিছনে বিরাট এক কারখানা (Organisation) এ'র নির্ম্মাতা ; আর এই Organisation'র হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হচ্চে সাম্রাজ্য-বাদী,—যে নিষ্ঠুর নিজের অস্বাভাবিক উদগ্র ক্ষুধার পরিতৃপ্তির

জন্য উপবাসী শিশুর আহার্য্যও অপহরণ করতে পরান্মুখ নয়!… চীনে ইউরোপ আমেরিকা থেকে কত মিশনারী' (missionory) এল। নির্ব্বোধ সরল স্ত্রী পুরুষকে ইহকাল এবং পরকালের সুখ স্বাচ্ছন্দের লোভ দেখিয়ে মন্ত্র পড়িয়ে ক্রীশ্চান করে নিলে; ভাগ্যবানের আত্মা নরকের পথ হতে ছিটকে একেবারে স্বর্গের সোজাপথ ধরলে। আধ্যাত্মিক উন্নতির স্রোতে যাদের ভাঁটা পড়ে গেছে, তাদের ভোলাতে গেলে রক্ত মাংসের দেহটীর সুবন্দোবস্ত করে দিতে হয়, এঁরাও তাই করলেন। উপরন্তু মতলববাজ ধর্ম্মপ্রচারকদের সংস্পর্শে এসে চীনের সমাজে ভাঙ্গন ধরলো। জন কয়েক পাদ্রীর অনুগ্রহে আত্মহারা হয়ে একদল চীনা আর দলকে ঘৃণা করতে সুরু করে দিলে, যেন তারা অন্ত্যজঃ আর নিজেরা সম্ভ্রান্ত। ফলে, সমাজ সংসারে অন্তর্বিপ্লবের সুরু হল। চীনের এই দৈন্যের সুযোগে পাশ্চাত্য-শক্তিরা সাম্রাজ্য বিস্তারে মনযোগী হলেন; এমনি করে ধর্ম্মের নামে হীন স্বার্থসিদ্ধির অভিনয় চলে আসছে। চীনে এই ধর্ম্মযাজকদের জামীনে অনুগৃহিত চীনেরই এক সম্প্রদায় নির্ভয়ে স্বদেশবাসীদের উপর অবজ্ঞাপ্রসূত অত্যাচার করে বেড়াতে লাগলো আর তাদের শ্বেতগুরুরা শাস্তি হতে অব্যাহতি দিয়ে তাদের অপকর্ম্মে উৎসাহিত করতে লাগলেন। বিজাতিয়েরা চীনে যীশুর বাণী প্রচার করতে এসে শেখালেন ভ্রাতৃদ্বেষ, প্রলুব্ধ করলেন আইন আদালতে ক্রীশ্চান চীনাদের সুযোগ দিয়ে, তাদের উৎসাহিত করলেন স্বদেশবাসীর সৎকার্য্যে বাধা দিতে।

A. H. Michie তাঁর The Englishman in China নামক পুস্তকে এই প্রসঙ্গে লেখেন,

"ক্রীশ্চান্-মত প্রচার করে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে বিরোধ গড়ে তোলার অর্থ কি? ধর্ম্মপ্রচারকরা চীনের জনসাধারণের সাম্‌নে নিজেদের এমন বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তারা তাঁদের চীনের ধ্বংসাভিলাষী শক্তিমান জাতিদের অস্ত্র বলেই ভাবে। রাজঅনুগ্রহ-প্রাপ্ত বসবাস-অনুমতির স্পর্শমণি নিয়ে তাঁরা আসেন; দেহ তাঁদের পবিত্র; চীনের আইনকানুন তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না।—এই হ'ল প্রথমাবস্থা। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা নিজেদের যেমন চীনের আধিপত্যের আবহাওয়া হতে স্বতন্ত্র রাখেন তেমনিই পবিত্র-ক্রীশ্চান্-চীনাদেরও সে সুবিধার মধুটুকু পান করিয়ে থাকেন। প্রাদেশিক আদালতে তাদের স্বপক্ষে লড়েন; পল্লীগ্রামের পঞ্চায়েৎ পর্য্যন্ত যেতে ভরসা করেন তাদের রক্ষার জন্য। এমনি করে পবিত্র-'ক্রশ্' (Cross) এর ধ্বজাবাহীদের পার্থিব সুবিধার বন্দোবস্ত করে তাদের মন জুগিয়ে থাকেন এমন কি অনেক missionary'র মূল উদ্দেশ্য হয় চীনাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য হতে বিচ্যুত করা, দেশীয় রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়কে অবজ্ঞা করিয়ে তাদের বিজাতীয়শক্তির শান্তিকুঞ্জে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা। এমনি করে ধর্ম্মপ্রচারকরা ধর্ম্ম এবং রাজনীতির সমস্ত জিদ্ নিয়ে চীনের অন্তর্জগতে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। দরিদ্র চীনকে এর জন্য রীতিমত মূল্য দিতে

হয়েছিল। এক গ্রাম আরেক গ্রামের বিরুদ্ধে লাগ্‌লো, এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, একটী সংসার আরেকটীর বিরুদ্ধে; এমন কি সংসারের মধ্যেই পরস্পরে দ্বন্দ্ব বেধে গেল।...

"যদিও কাগজে কলমে চীনাপ্রজাদের রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁরা পান্‌নি, তবু্‌ও কাজে কর্ম্মে তাই হয়ে আস্‌ছে; আর তার প্রতিবাদও হয়নি। বিজাতীয় ধর্ম্মপ্রচারকরা ক্রমশঃ এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, প্রাদেশিক রাজশক্তি তাঁদের ভয়ও করে এবং মনে মনে ঈর্ষাও পোষণ করে। শান্তিপ্রিয় Governor (প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা) নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের অনুরোধ করেন, যেন কোনও কারণে বিদেশীদের সঙ্গে অথবা দেশী ক্রীশ্চান্‌দের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ না ঘটে। তার মানে এই যে, চীনাক্রীশ্চান্‌রা ন্যায় অন্যায় যাই করুক্ না কেন, সমর্থিত হবে।"

আমাদের দেশেও প্রায় এমনই হয়ে থাকে। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কোনও জাতি কোনও দেশের ওপর আধিপত্য করলেই অধীন জাতিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের সৃষ্টির মূলেও এই উদ্‌ঘাটীত-রহস্য। ইংরাজ আমলেও তারই পুনরভিনয় হচ্চে। তবে আপত্তি কিসের? মুসলমানদের ধর্ম্মের অত্যাচার যদি বরদাস্ত করে থাকি ত' ইংরাজেরই বা পারবোনা কেন? এর উত্তর হচ্চে এই যে, মুসলমান আমলেও বিনা দ্বিধা বা আপত্তিতে তা' সংঘটিত হয়নি,

নির্ব্বিঘ্নেও হয়নি ; উপরন্তু সে যুগের মানুষে আর এ যুগের মানুষে প্রচুর প্রভেদ, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি আধুনিক যুগের গৌরবচিহ্ন। একটা যুগ এগিয়ে এসেও পুরাতন হীনবৃত্তির পরিতৃপ্তিসাধন আরো নিন্দনীয় নয় কি? তা যদি না হয় ত বিংশশতাব্দীর ইংরাজকে বা আমেরিকান্‌কে ষোড়শ শতাব্দীর কুসংস্কারপূর্ণ মুসলমানের সঙ্গে সমান করতে হয়। অথচ একথা কেউ সঙ্গত মনে কর্‌বেন না; সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্য-দেশীয়দের ধর্ম্মসম্বন্ধে হীনতা গুরুতর কলঙ্কচিহ্ন! এবং সর্ব্বোপরি অভিযোগ এই যে, তখনকার কালে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গোঁড়ামী এবং কুসংস্কারই ছিল এ অপকর্ম্মের প্ররোচক, আর অধুনা এ'র মূলে আছে কূট-রাজনীতির মন্ত্রণা।

ধর্ম্মের আসল আদর্শ এমনি করে পথ হারিয়ে গেল আত্ম-স্বার্থান্বেষী মানুষের অক্ষম ইঙ্গিতে। ধর্ম্ম, মানুষের বল না হয়ে হ'ল সবলের বিলাস এবং দুর্ব্বলের বিভীষীকা।

সাম্রাজ্যবাদীদের হীন আদর্শের মূলে যারা আঘাত কর্‌বে, তারা এই আদর্শোদ্ধারের পথে যা সহানুভূতি বা সাহায্য দেখাবে তাকেই ধ্বংস করতে বাধ্য। পাশ্চাত্যজাতিদের ক্রশ্চান্‌ধর্ম্মপ্রচারও সাম্রাজ্যবাদের গোড়ার কথা। সুতরাং চীনের যুবজন ক্রীশ্চান ধর্ম্মের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেযে, যে আদর্শ তোমাদের সাম্‌নে লোভণীয় করে তোলা হচ্চে সেটা মুখোসমাত্র; অন্তরে আছে ওর হীনবর্ব্বরতা। তারা

রীতিমত Demonstration সুরু করে দিলে। ১৯২২ সালে Anti-Christian-Student-Federation (ক্রীশ্চান-বিরোধী ছাত্র-সম্প্রদায়) এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী কর্‌লে,

"তথাকথিত ধর্ম্মের অনেক পাপ। নীতির দিকদিয়ে দেখ্‌তে গেলে, মানুষকে তা নিছক বাধ্যতাই শিখিয়েছে যা ক্রীতদাসের নীতিছাড়া অন্য কিছু নয়। মনের দিক দিয়ে দেখ্‌লে, তা মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করেছে—যা, সত্য-সন্ধানের পথে বিরাট বাধা! আর দেহাত্মবাদের ত কথাই নেই, সে শুধু স্বর্গ আর নরকের স্বপ্ন দেখ্‌তে শিখিয়েছে যার পরিণতি হবে নরজীবনের ধ্বংস-প্রাপ্তিতে। ধর্ম্ম-শিক্ষার কোনও মূল্যই নেই, উপরন্তু এর দোষের পরিমাণ হয় না; উত্তরোত্তর অপকার বেড়েই চলেছে। এর ফলে হয়েছে এই যে, অত্যাচারীদের ব্যবস্থা আছে, পিছনে আছে Organisation. আর আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই কিন্তু সে সাহায্যে বঞ্চিত।

"সব ধর্ম্মের মধ্যে এই 'ক্রীশ্চান্ ধর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা হেয় বলে মনে হয়; এর এক প্রধান পাপ এই যে, সে ধন-গর্ব্বিত সমর প্রিয়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর প্রতিপত্তি ক্রমে বেড়েই চলেছে, ফলে এর অত্যাচার বাড়ছে। সাম্রাজ্যবাদ আর ধনবাদের মত ক্রীশ্চান্ ধর্ম্মও মানবতার শত্রু। এদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক—দুর্ব্বলকে শোষণ করা। চীনকে পাশ্চাত্যজাতিরা বহুদিন হতে শোষণ কচ্ছে। ধর্ম্ম হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের চর,—ভাড়াকরা গুপ্তহন্তা।

যদি এই অন্যায়ের উচ্ছেদ করা না হয় তাহলে চীনের ভবিষ্যৎ-ভাগ্যে কি আছে বল, দুস্কর।—

চীনের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযানের সারাংশ এই পূর্ব্বোদ্ধৃত রচনা থেকেই পাওয়া যায়। এই প্রচণ্ড প্রতিকূলতার ফলে চীনা-ক্রীশ্চানদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল; তারা বিজাতীয় ধর্ম্মপ্রচারকদের আধিপত্যে—ক্রীশ্চান চার্চ্চের আজ্ঞাবহনে অস্বীকৃত হল। পাশ্চাত্যজাতিদের গুরুগিরি সহ্য করতে তারা নারাজ। দশবিশহাজার সভ্য নিয়ে পঁচিশটি বিভিন্ন সমিতির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব সুন্দর সংঘের জন্ম হ'ল,--নাম **Taoyoyuan**। এর উদ্দেশ্য—পৃথিবীর পাঁচটি ধর্ম্মের সমন্বয় করা; তাও'ধর্ম্ম (**Taoism**), কন্‌ফুসিয়ান্'ধর্ম্ম (**Confucianism**) বৌদ্ধধর্ম্ম (**Baddhism**), মুসলমানধর্ম্ম (**Mahomedanism**) আর ক্রীশ্চান্‌-ধর্ম্ম (**Christionity**) এই পাঁচকে এক করা। এই সময়ে—চীনের এক নব্যভাবাপন্ন অবতার ঘোষণা করলেন,—"গভীর দুঃখে আমি অভিভূত, ভগবানের অভিশাপ আস্‌ছে তোমাদের ওপর"

'কন্‌ফুসিয়ানিস্‌ম্' এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরে, আর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযানের পূর্ব্বে ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্ম নিয়ে অনেক আলোচনা বাদানুবাদ হয়ে গেল, কেউ বল্‌লে—মানবতার আদর্শ ধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করবে। আবার কেউ বল্‌লে, এসম্বন্ধে প্রত্যেককেই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত; যার যা'কে ভাল লাগে

পড়ুক, বুঝুক্। আবার একদল বল্‌লে,—কোনও ধর্ম্মই অনুশীলন-যোগ্য নয়। এমনি নানা মতের সৃষ্টি হ'ল।

কন্‌ফুসিয়ানিস্‌ম্' এর বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন খুব জোরেই চলেছে তখন নেতাদের প্রশ্ন করা হয়—"কনফুসিয়ানিস্‌ম্'ছাড়া অন্য ধর্ম্মকে আক্রমণ করনা কেন? সে ধর্ম্ম পাশ্চাত্য বলে কি?"

নেতারা এর উত্তর দিলেন,—

"New youth (নব-যৌবন) পত্রিকার সম্পাদক আমরা পাশ্চাত্যধর্ম্মের পূজারী নই। এখন কোনও পাশ্চাত্যধর্ম্মকে আক্রমণ করিনা এই কারণে যে, 'কন্‌ফুসিয়ানিস্‌ম্' চীনে যতখানি বিষ ঢেলেছে—ক্রীশ্চান্-ধর্ম্ম ততখানি ঢাল্‌তে পারে নি সুতরাং একটু অপেক্ষা করছি,—"

এমন সময় জগৎ-জোড়া যুদ্ধের দামামা বেজে উঠ্‌লো; চীনে আন্দোলনও ঘোরতর হয়ে এলো। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যা কিছু আন্দোলন সবই ঐ ক্রীশ্চান-ধর্ম্মের মূলে নির্দ্দিষ্ট হ'ল। সে সময়ে এক নেতা বলেছিলেন,—

"শক্তিমানজাতিরা প্রায় সবাই ক্রীশ্চান্।...চীনে ঐ ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর।" ১৯১৯ সালের বড়দিনে, কোনও কাগজ Jesus Number (যীশু-সংখ্যা) বার করে ক্রীশ্চান্‌ধর্ম্মকে রীতিমত ঠুকে দিয়ে বল্‌লে,—যীশুর শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নেই, একদিকে ছড়াচ্ছেন বিশ্বপ্রেম আর মহামানবতার মন্ত্র আর অন্যদিকে সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপরতা আর জঘন্য-প্রতিহিংসার ছবি জাজ্জ্বল্যমান!

১৯২০ সালে Young China Association (চীন-যুব-সমিতি) ঘোষণা করলে যে, ধর্ম্মবিশ্বাস-সম্পন্ন কোনও ব্যক্তি এ সংঘের সভ্য হতে পারবেনা। একদল সভ্য এ'র প্রতিবাদ করলে। জাপান থেকে এক চীনা ছাত্র প্যারিসে তার বন্ধুকে লিখলে,

"সংঘের নিয়মানুসারে ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে সবাই স্বাধীন, জড় এবং মনোজগতের কাজে ধর্ম্মবিশ্বাসের সমন্বয় হয়ে থাকে। Hebrew জাতি অদ্বৈতবাদী, গ্রীক্‌রা ঠিক্ উল্‌টো; কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাস এদের একই। Tolstoi খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, আর Spinoza'র বিশ্বাস যে ভগবান সর্ব্বত্র,সবই ভগবান,তিনি ছিলেন Pantheist; কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি কাউকে উচ্চ অথবা নীচ দেখিনা, দুজনের ব্যক্তিত্বে স্বাতন্ত্র নেই।...আমার নিজের কোনও ধর্ম্মমত না থাক্‌লেও আমি তাঁর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন যিনি বলেছিলেন, —"যদিও আমি যীশুখৃষ্টকে Son of God (ঈশ্বরের প্রতীক্) বলে বিশ্বাস করিনা, তবুও তাঁর সুশিক্ষার সমাদর করি,—'বাইবেলে'র সাহিত্যিক উপাদানকে মর্য্যাদা দিই। ধর্ম্ম, শিল্প, বিজ্ঞান সবেরই মূল্য মানুষের প্রয়োজনীতার ওপর নির্ভর করে।...'বাইবেলে'র সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করে আমি যীশুর উন্নত-ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছি। বাস্তব-পথে ধর্ম্মের আদর্শকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করলুম্। আশাকরি তুমি এবং প্যারিসের অন্যান্য বন্ধুরা— এ সম্বন্ধে বিবেচনা কর্‌বে।"

সভ্যবৃন্দের মধ্যে প্রতিবাদের ফলে Young China Associa-

tion (চীন-যুব-সমিতি) র প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হ'ল। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে উদার পর্য্যবেক্ষণ আর গবেষণার দরকার। কুসংস্কার সম্বন্ধে যাঁরা নরমপন্থী ছিলেন তাঁরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন,

"সমাজকে সংযত করবার জন্য ধর্ম্মের সৃষ্টি, মানুষের অভাব অভিযোগ পূরণের জন্য তা' আবশ্যকীয়; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার প্রাদেশিকতা অথবা জাতীয়তার নাগালের বাইরেই তার স্থান। ব্যক্তিগত জীবনের সার বস্তুর সঞ্চয় হ'বে এর উদ্দেশ্য আর এই ধর্ম্মকে সুন্দর করে তুলতে হবে বিজ্ঞানের সাহায্যে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বীয় মতামত বিশ্লেষণ করে একজন ছাত্র লিখলে,

"ধর্ম্মবিষয়ে আমার মনোভাব সপক্ষে অথবা বিপক্ষে নয়; এ শুধু একটা প্রশ্ন। সেদিন এক ক্রীশ্চান' বন্ধুর সঙ্গে কথা করে বুঝলুম তিনি চীনা-ক্রীশ্চানের উপর অসন্তুষ্ট। তিনি বললেন, "ওদের সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নেই।" আমার বিশ্বাস এ মন্তব্য অপ্রয়োজনীয়। তাঁরা শুধু গির্জ্জা আর 'ভজনালয়' নির্ম্মানেই পটু, আর অসংখ্য ভণ্ডশিষ্য সংগ্রহনে সুদক্ষ।—একথা বলিনা যে, এঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট লোক নেই; কিন্তু থাকলেও তাঁরা ধর্ম্মপ্রচারে যতখানি মন দেন তারচেয়ে কম মনযোগী হন প্রকৃত ব্যবহারিক কার্য্যে। তাঁদের ধর্ম্মে বিশ্বাস করবার মত লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টাই তাঁদের প্রধান কাজ, এ অবস্থা সত্যিই শোচনীয়।"—

চীনের যৌবন অভিযান

ফ্রান্সের একজন চীনাছাত্র প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-দের প্রশ্ন করে পাঠালে—

(১) মানুষ কি ধার্ম্মিকজীব ?

(২) আধুনিক জীবনে প্রাচীন অথবা নবীন ধর্ম্ম সকল প্রযোজ্য কি ?

(৩) নব্য-চীনের কোনও ধর্ম্মের আবশ্যক আছে কি ?
তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তরে Granet Barbusse, Bougle প্রভৃতি অধ্যাপকরা উত্তর দেন—"না", তাঁদের মধ্যে একজনের বিশ্বাস চীনের কোনও ধর্ম্ম নেই এবং বাইরে থেকে কোনও ধর্ম্মের আমদানী করা বিপজ্জনক, চীনে খৃষ্টধর্ম্ম পাশ্চাত্য-জাতিদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের যন্ত্র-স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়ায় তিনি দুঃখিত।

আমাদের দেশে যে সব ছাত্রেরা Missionery স্কুলে পড়ে তারা প্রায় সাধারণ স্কুলের বালক বালিকাদের সঙ্গে মেশেনা। চীনেও 'মিশনরী (Missionery) আর সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্ন সম্প্রদায় হয়ে উঠেছিল! আর এই পৃথক্-মনোভাবের প্রধান কারণ, Missionery-স্কুলের ভরণপোষণের ভার ছিল ধনী পাশ্চাত্য-জাতিদের ওপর ; অর্থ এবং শাসন সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য বিদেশ থেকে আস্তো, কিন্তু এরূপ বাধা থাকতেও পরস্পরের স্বার্থের সমন্বয় ঘট্‌লো খেলাধুলো প্রভৃতি ছাত্রোপযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যে ; পরিশেষে বিরাট ছাত্র-

আন্দোলনে দুই এক হয়ে গেল, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযানে দুবলই ঘোষণা করলে যে, পৃথিবীর ধর্ম্মযুগ শেষ হয়ে গেছে ; সুরু হয়েছে বিজ্ঞানের যুগ। ধর্ম্ম স্বীয় প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে।

Dr. Tsai Yuan-pei ধর্ম্মবিরোধী-সম্মিলন (Anti-Religion federation)'র সভায় তাঁর মত প্রকাশ করে বলেন যে, ধর্ম্মকে একপ্রকার দার্শনিক-বিশ্বাস বলা যেতে পারে। বর্ত্তমান সব ধর্ম্মই নষ্ট, মিথ্যা এবং আদর্শচ্যুত; কতকগুলি বাহ্যিক-বিশ্বাসের বোঝায় ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনে বাধা দিয়ে থাকে। Educational Independence (শিক্ষাসম্বন্ধে স্বাধীনতা) প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, শিক্ষা ধর্ম্মের বাধা হতে মুক্ত হ'বে। ক্রীশ্চান ছাত্রদের সম্মিলীত হওয়ার সার্থকতায় তিনি সন্দিহান। ধর্ম্মকেই কেন্দ্র করে যদি কেউ আন্দোলন করে তাঁরাও ধর্ম্ম-বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন করবেন! এরাই খুব স্বভাবিক। কেউ যদি প্রশ্নকরে, এই ধর্ম্ম-বিরোধিতা বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণকরেনাকি? তার উত্তর হচ্চে—'করেনা', কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে বললেই, স্বাধীনতার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়; ঠিক তেমনই কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকাও স্বাধীনতার পরিচায়ক।

Anti Religion Federation (ধর্ম্ম-বিরোধ-সম্মিলন) এ Mr Uong বর্ক্তৃতাতে বলেন,

"গোড়াতে ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার দুরকম অভিমত ছিল : প্রথমতঃ

বৌদ্ধ হোক্, খৃষ্ট হোক্ যে কোনও ধর্ম্ম হোক্না কেন নিরপেক্ষ-ভাবে অনুশীলন করা, দ্বিতীয়তঃ সব ধর্ম্ম-বিশ্বাসীকে সম্মান করা। ...কিন্তু আজ তৃতীয় অভিমতের সৃষ্টি হয়েছে ;—ধর্ম্ম-বিশ্বাসীদের বাধা দেওয়া। পরস্পর সাহায্যে বিশ্বাস করি বলেই এতদিন তাদের সম্মান করে এসেছি ; কিন্তু দেখছি তারা আমাদের সম্মান করেনা উপরন্তু আক্রমণ করতে আসে।—এই Anti Religion Federation বা ধর্ম্ম-বিরোধী-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাধা প্রদানের ইচ্ছাকে প্রকাশ করা ; দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিই। যখন আমি ফ্রান্সে যাই, সঙ্গে কোনও আত্মীয়ের একটী ছেলে ছিল। তখন তার বয়স আট কিম্বা নয় বছর। দুবছর সে এক Catholic স্কুলে পড়েছে। শয়নকালে সে শয্যাপ্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসে' বিড় বিড় করে কি বলে' ক্রুশ-চিহ্ন (Cross) টীকে চুম্বন করতো। কি কর্চ্ছো ? জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতো,—মাষ্টার মশাই বলেদিয়েছেন, শুতে যাবার সময় প্রেতাত্মারা আত্মাকে খাবার জন্য বিছনার কাছে এসে হাজির হয়। কিন্তু সে সময়ে ভগবানকে ডাক্‌লে তারা কাছে আসতে পারে না। এই ঘটনার পর থেকেই আমি ভাব্‌ছি।"

খৃষ্টধর্ম্মকে সমর্থন করে যে সম্প্রদায় গড়ে উঠলো এই আন্দোলনের পথে, তাদের আক্রমণকরে ধর্ম্মবিরোধীরা বললে, "খৃষ্টধর্ম্ম ভণ্ড, সমর-প্রিয় এবং অর্থ-বিলাসী ; এদেরই সাহায্যে গত মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছিল।" ওদিকে ধর্ম্ম-সমর্থন-

কারীরা এই বলে প্রতিবাদ করলে যে,—প্রতীচীর নৃশংস বৈজ্ঞানিকরাই এ যুদ্ধের মূলকারণ, কারণ তাদের আধ্যাত্মিক দিক্‌টা একেবারেই চাপা পড়েছিল। একজন ছাত্র লিখ্‌লে,

"মনে রাখ্‌বেন,—আমি বিজ্ঞান-বিরোধী নই, কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে যাঁরা ধর্ম্মকে আক্রমণ করেন, পৃথিবীর সব কিছুরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন এবং বিজ্ঞানকে মানুষের জীবনের চেয়ে বড় বলে মনে করেন—আমি তাঁদের বিরুদ্ধে। আমি এই জড়-বাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে নই, কিন্তু যারা এই সভ্যতার মোহাচ্ছন্ন অথবা ক্রীতদাস তাদের বিরুদ্ধে। গত যুদ্ধের ফলে, সভ্যতার দেউলে হয়ে যাবার উপক্রম দেখে মনে হয়, নিছক্ দেহাত্মবাদই এর জন্য দায়ী।...মনুষ্য-জীবনকে উন্নতকরাই হচ্চে জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।...বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে অধ্যয়ন অথবা আয়ত্তকরা যেতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনকে হেয় প্রতিপন্নকরাকে আমি যুক্তি যুক্ত মনে করিনা। বিজ্ঞান জড়-জীবনে সহায়ক হতে পারে,—আধ্যাত্মিক জীবনে নয়।"...

ধর্ম্মবিরোধীদের চরম-মতকে অগ্রাহ্য করে পিকিংএর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'ল Chao Tsojenর নেতৃত্বে। কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্মে আস্থাবান না হলেও এঁরা ধর্ম্মবিশ্বাসে স্বাধীনতার প্রশ্রয় দিতেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন,—

"কোনও চার্চ্চের সভ্য আমরা নই, কোনও ধর্ম্মকেও আমরা সমর্থন করিনা, আবার ধর্ম্ম-বিরোধীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্নও

নই। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্ম-বিষয়ে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, কেউ বাধা দেবে না; উপরন্তু আইনে এ বিষয়কে সমর্থন করা হয়েছে; শিক্ষিত ব্যক্তিদের এই পথেই চলা উচিত। যাই হোক্, এই মতকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য তাঁদের না হওয়াই উচিত।"—

Liang Chi-Chao "দর্শন-সভার" (Philosophic Society) "ধর্ম্ম-বিরোধী-সংঘ" প্রসঙ্গে বলেন, গত মাসের মধ্যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেশ পাকিয়ে উঠেছে। ঐ ঘটনা অতি উত্তম; কেন ?—কারণ ধর্ম্ম এতদিন চীনে সমস্যা বলে পরিগণিত হয়নি, আজ হচ্চে। চঞ্চল-মনোভাব প্রকাশের পথ পেয়েছে, সেটাই লাভ।

"আমার ক্রীশ্চানদের দু এক কথা বলবার আছে। আশা করি আজ হতে তাঁরা এ আন্দোলনের সাড়ায় জাগরিত থাকবেন। চীনে শিক্ষা বিস্তারের তাঁরা সাধু চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত-বিশ্বাসকে সম্মান করা উচিত; আর তাঁরা যেন খৃষ্ট-ধর্ম্মকেই ভাল মন্দের মাপকাটী বলে বিবেচনা না করেন। সমাজের যদি তাঁরা ভাল করতে চান, তা' হলে তাঁদের ভক্তি করবো। কিন্তু স্বধর্ম্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধিই যদি তাঁদের উদ্দেশ্য হয়, তা'হলে এই কথা বলবো যে, তাঁরা ধর্ম্মের প্রকৃত-অর্থের সম্ভ্রম-হানি করেছেন। পরিশেষে, আমার আশা এই যে, "ধর্ম্ম বিরোধী সংঘের" সভ্যেরা আজ হ'তে চীনের কুসংস্কার দূরীকরণে

মনোযোগী হবেন। এই সব অন্ধ-বিশ্বাস আর কুসংস্কার খৃষ্টধর্ম্মের চেয়ে চীনের অধিক ক্ষতি কচ্ছে।" —

এই আন্দোলনের পরিণতির পথে যৌবন-অভিযাত্রীরা চীনা ক্রীশ্চানদেরও সহভাগিতায় উৎসাহিত হ'ল। চীনে ক্রীশ্চান-সম্প্রদায়ের মধ্যেও তখন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। তারা ঘোষণা করলে যে, আজ তারা বিদেশী ধর্ম্ম প্রচারকদের অধীনতা হ'তে মুক্ত। সাম্রাজ্যবাদী এবং অর্থ-বিলাসীদের সম্পর্কে আর তারা তুষ্ট নয়; তারা অপরের প্রভাব বিমুক্ত।

ধর্ম্ম হচ্চে মানুষের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির পরিপোষনের সহায়ক; নিকৃষ্ট হীন-বৃত্তির প্রসাধনের বিলাস-বস্তু নয়। স্বার্থান্বিত মানুষের সান্নিধ্যে এসে ধর্ম্মের আদর্শ হীন হয়ে এসেছে; যেটুকু আছে সেটুকু হয় বাহ্যাড়ম্বর, না হয় জীর্ণ-কাঠামো। শুধু বাহুবলের বিক্রমে প্রতীচী আজ খ্রীষ্টধর্ম্মকে বর্ত্তমান সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে চায়; কিন্তু দেহান্তরালের অদৃশ্য-বস্তুটীর সঙ্গে যা'র সম্পর্ক, দেহের দম্ভ তা'কে চিরকাল দাবিয়ে রাখতে পারে না; তাই আজ সব ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মেরও বস্তুহীন-অন্তর উন্মুক্ত হয়ে গেছে জগত-বাসীর জাগ্রত-জীবনে। স্বার্থপর জগতে ভাল মন্দের বিচার হয় না, তবে অভিজ্ঞতার পথে ভাল'র সন্ধান নেওয়াই আদর্শ কর্ম্ম-জীবনের লক্ষ্য। চীনের যুবজনও সেই ভাল'র সন্ধানে চলেছে,—যে হবে তার যৌবন-দেবতা, তার নব-সভ্যতার পীঠস্থানে অধিষ্ঠিত পূণ্য-বিগ্রহ।

—নয়—

যেথা পড়ে আছে সাত-পুরুষের ভিটে
হবে রচা যেথা ভবিষ্যতের-বাসা।
অমূল্য তার একরতি মাটি-ছিটে ;
তা'রি সেবা হোক্ সবার চরম-আশা ॥
জন্ম-ভূমির নিত্য-কালের-ঋণ
যে নারে শুধিতে, ত'র মত নাহি দীন ॥

বিশ্বসৃষ্টির সূচনায় যে রহস্যময় ইতিবৃত্ত রচিত হ'ল তা' বিশ্বের শ্রেষ্ঠজীব মানবেরও জ্ঞান বিজ্ঞানের অগোচরে রয়ে গেল' আবহমান কাল, সে রহস্যোদ্ধার বোধ হয় অনন্ত-কাল অনুদ্ঘাটিতই থেকে যাবে। কল্পনাপ্রিয় মানব এই সৃজন-পর্ব্বের কত ব্যাখা করেছে, আজও সে কল্পনার শেষ হয়নি। যখনই মনে হয়, অমলিন-পায়ের প্রথম-রেখাটী মাটীর বুকে সন্তর্পণে ফেলে প্রথম-মানুষ এলো, প্রথম-তৃণের সবুজ গুচ্ছ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে উঠলো, ওগো মানুষ, তোমার পায়ের আঘাত লাঘব করবার জন্য এসেছি, প্রথম-তরুর মর্ম্মরে ধ্বনিত হলো, ওগো মানুষ, তোমার দেহের ক্লান্তির শুশ্রূষার জন্য শাখা বিস্তার করেছি ; তখন কল্পনা রাজ্যের পসারিটী যেন আমার মনের দুয়ারে স্বপনের ফিরি করে বেড়ায়। তখন ভাবি, যে রাজ্যে ঐ রহস্যের আধার সযত্নে রক্ষিত, সে রাজ্য

আমার কল্পনার পক্ষে দুর্গম হলেও এই সত্যের সন্ধান আমি কল্পনার সাহায্যে পেয়েছি যে, ঐ শুভক্ষণের প্রথম-মুহূর্ত্ত হতেই মাটীর সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

তারপরে কতকাল কেটে গেছে। মাটীর ওপর মানুষের দাবী গভীর হয়ে আঁকা হয়ে গেছে! ধরিত্রী নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়েছে মানুষের সম্পদ-সম্ভারে আর মানুষ নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়েছে ধরিত্রীর ধর্ম্ম-রক্ষায়। মাটী, আর মানুষের পায়ের তলার কঠিন ভূতল নয়; সে আজ দেশ-মাতা।

বিশ্বের অংশ-বিশব জুড়ে এক একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত; রাজ্যের বেষ্টনীর অন্তর্ভূত ভূ-খণ্ডটুকু জাতি-বিশেষের দেশ। দেশের সঙ্গে দেশবাসীর-স্বার্থ সমন্বিত—অভিন্ন; তাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতিদের সংঘর্ষের মূলে আছে স্বার্থ। স্বার্থ ক্ষুন্ন হ'লে এক দেশ আর এক দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সঙ্কোচ করে না, সেই তা'র ধর্ম্ম। বিজাতীয়ের কলুষ-স্বার্থের পীড়ন-ভারে চীনের জীবন আজ বিপর্য্যস্ত; তাই আজ চীনের লক্ষ কোটী নর নারী দেশ-মাতার ধর্ম্মরক্ষার্থে বদ্ধপরিকর; নিঃশঙ্কচিত্তে সমাজ, সংসারের মায়া কাটিয়ে জীবন-পন করেছে"।

যুবজনের জাগরণের অনতিপূর্ব্বে চীনের শোচনীয় অবস্থার ইতিহাস পাঠকের গোচর করা হয়েছে। জন্মভূমির আশঙ্কাচ্ছন্ন জীবনে এ'ল মূর্ত্ত-বরাভয়—যৌবন-অভিযান। কেমন করে ঘর-ছাড়া, বাঁধন-হারা শঙ্কাহীনের দল অতীতের অনুপযুক্ত 'ধর্ম্মসাক্ষী·

অনুষ্ঠানকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে চল্‌লো ; প্রাচীনতার কঙ্কাল-গরবী সংসার, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র সব কেমন করে এই উদ্ধত অভিযাত্রীদের পায়ের তলায় গুঁড়ো হয়ে গেল, সে সব আর পাঠকের অগোচরে নেই। দেশ-মার শৃঙ্খল-মোচন-প্রয়াসে তা'দের শুধু স্বার্থানুরাগই প্রকট হয়ে ওঠেনি, এই কুটীলতা-প্রধান পৃথিবীর ওপর তাদের অসীম অনুরাগও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এক তরুণ-চীনার নিম্নোদ্ধৃত পত্র হতেই তার আভাষ পাওয়া যায়—

"স্বাধীনতার জন্য আমরা যে এতকাণ্ড করছি, সে শুধু নিজেদের স্বার্থসন্ধানেই নয়। অকৃত্রিম-দেশভক্তির দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত বটে, কিন্তু এই দেশ-প্রেমিকতা আমাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দেয়নি ; অপর জাতির প্রতিও ন্যায়-নিষ্ঠা আমাদের কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি। কিন্তু আমাদের আদর্শোদ্ধারের পথে অনেক বাধা। জগতে ভণ্ডামী আর লোভের প্রাধান্য দেখে এক এক সময় হতাশ হয়ে যাই ; কিন্তু তবুও আশায় বুক বেঁধে রাখি যে, সুদূর ভবিষ্যতেও একদিন মানুষের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ—সত্য ও ন্যায়ের জয় হবেই।"

তাই হোক্! তা'র সম্ভবনার খাতায় শূন্য অথবা কতখানি অঙ্ক পড়বে তা' নিয়ে বাদ-বিসম্বাদে কাজ নেই, মানবের সদ্‌বুদ্ধি কি পরিমাণে সবল হ'লে অসৎ-কর্ম্মের বিরাট পাহাড়কে ভূমিসাৎ করতে সক্ষম হ'বে, এ আলোচনায়ও মস্তিষ্ক-বিকৃতির প্রয়োজন নেই ; শুধু মনে থাক্ অমলিন্ অকৃত্রিম আশা আর প্রাণে দুঃসাধ্য

স্বপ্নোদ্ধারের আদম্য আগ্রহ। এই দুটী অমূল্য সম্পদকে পাথের করে চীনের, যৌবন অভিযান সুরু হয়েছে। এ অভিযান হয়ত চিরন্তন নয়, কারণ এর আবশ্যকতা অনন্তকালের জন্য নয়। অভি-যানের নাটকীয়-আখ্যান-ভাগ পরিসমাপ্ত; কিন্তু সেজন্য এ'র মূল্য-হ্রাস হয়নি, এর স্বার্থকতা ক্ষুন্ন হয়নি।

স্বদেশ-উদ্ধারের সার্থক-প্রচেষ্টার কতখানি অংশ চীনের ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রাপ্য সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকা সম্ভব নয়; তারাই আন্দোলনের অগ্রদূত, তাদেরই তরুণ-জীবন দিয়েই মাতৃ-পূজার প্রথম অর্ঘ্য রচিত হয়েছিল।

কিন্তু ছাত্রসম্প্রদায়ের এই জাগরণ যেন একটু আকস্মিক; কারণ এর আগে সাধারণের ব্যাপারে ছাত্রেরা উদাসীন থাক্‌তো, তারা নিজেদের শ্রেণীকে সাধারণের গণ্ডী হতে পৃথক করে ফেলে-ছিল, যেন কার বিশেষ অনুগ্রহে তারা উদ্ধত। তবে তখনকার অবস্থাকে চীনের ঘুমন্ত অবস্থা বল্‌লেও অত্যুক্তি হবেনা; জাগ্রত চীনের জীবনে এই ছাত্ররাই জনসাধারণের দাস বলে' নিজেদের পরিচয়দিয়ে গৌরব অনুভব করছে। ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই তারা খুচরো মালপত্র নিয়ে চীনময় ছড়িয়ে পড়লো—মুখে কথা আর বক্তৃতা। ছুটীর সময় গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে বক্তৃতা দেওয়াই যেন তাদের কর্ত্তব্য হয়ে উঠ্‌লো। কেউ যেতো তার-বেতারের যন্ত্রনিয়ে সঙ্গীতকে সাথীকরে; কেউ যেতো খেলাধুলার আনন্দ নিয়ে; কেউবা শুধু বক্তৃতা করতেই যেতো। গ্রীষ্মের ছুটীর

সময় স্বগ্রামে ফিরে এসে তারা অবৈতনিক পাঠশালা খুলে বস্‌তো, ছেলে বুড়ো সবাইকেই ছাত্র কর্‌তো। এম্নিকরে তারা মন্দিরকে শিক্ষা-কেন্দ্র করে তুল্‌লে; মন্দিরের প্রাঙ্গন হ'ল খেলার মাঠ।... কলেজের একজন অধ্যাপক লিখেছেন—

"১৯২১ সালের গ্রীষ্মে Foochow কলেজের ১৮৩ জন ছাত্র অবৈতনিক-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে এক সংঘ গড়্‌লে। আমি বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলুম্‌। আমাকেই সংঘের নেতৃত্বের-ভার দেওয়া হ'ল। ২৮টা দলে এরা ভাগ হয়ে গেল, প্রত্যেক দলের সঙ্গে রইলো একটা করে চীনের জাতীয়-পতাকা। ছুটী সুরু হতেই যে যার বাড়ী চলে গেলো, সেইখানেই বিদ্যালয়-স্থাপনে সচেষ্ট হ'ল'।

অবসর-অবসানে সবাই কলেজে ফিরে এলো। বালক বালিকাদের জন্য তা'রা ২৮টা বিদ্যালয় স্থাপন করে এসেছে,— মোট ছাত্রসংখ্যা প্রায় তিন হাজার।"

চীনের এই ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনের তুলনা করতে গেলে প্রকৃতই লজ্জায় ম্রিয়মান হ'তে হয়। আমাদের দেশে সুরু হ'তে হ'তে ওদের হয়ত সারা হয়ে যাবে; কিন্তু তা'সত্ত্বেও সুরু হওয়াটাই দরকার। ভারতবর্ষের স্কুলকলেজের ছাত্ররা সজাগ হয়েছে; প্রায়ই শোনাযায় কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের অসহযোগিতা-চলেছে, ছাত্ররা অধ্যক্ষর অন্যায়-কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছে; তাদের নিরুপদ্রব-সংগ্রাম

জয়-যুক্ত হোক্। এ'র প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা' এই বল্লেই সুস্পষ্ট হবে যে, সম্মানে, বয়সে বা ক্ষমতায় বড় হলেই নির্ব্বিচারে অত্যাচার করবার অধিকার জন্মায় না; কেউ এ অন্যায় অধিকার প্রতিপন্ন করতে চাইলেই বাধা-প্রদানই হ'বে কনিষ্ঠদের ধর্ম্ম· মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি পরিপুষ্ট হলেই ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা তার প্রাপ্য এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা পাপ।

যাই হোক্, এদেশের ছাত্ররাও উদাসীনতার আবরণ উন্মোচন করেছে, যে সব বিষয় জোর করে, তাদের জীবনের গণ্ডীর বহির্ভূত করা হয়েছিল, সেই সব আজ তারা আত্মীয়তার মধ্যে এনে ফেলেছে। প্রকৃত ছাত্র-আন্দোলনে দেশের, বিশেষতঃ আমাদের মত বিজাতী-শোষিত পরাধীন দেশের যে প্রভূত উপকার সম্ভব-পর হয় তা চীনের দৃষ্টান্তেই সুপরিস্ফুট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতখানি আন্তরিকতা নিয়ে, অত তীব্র আকাঙ্খায় উৎসাহিত হয়ে আমাদের দেশের ছাত্রসম্প্রদায় প্রকৃত কর্ম্মজগতে নাম্‌তে পারেনি; তার প্রধান কারণ অনেক পুরুষের বদ্‌অভ্যাসে তারা বিলাসী, সংসার সমাজের অন্যায় প্রশ্রয়ে তারা তামসিক, আর তাদের মধ্যে প্রকৃত-কর্ম্মের যথেষ্ট চাহিদার সৃষ্টি হয়েন। তাই মনে হয় এদেশের সমস্ত ছাত্রসম্প্রদায়কে জাগাতে হ'লে অনেক কিছুরই সংস্কার করতে হ'বে—ভাঙ্গতে হবে। সংসার, সমাজ, ধর্ম্ম রাষ্ট্র সবের মূলেই প্রকৃত আঘাত করতে সক্ষম—ছাত্র সম্প্রদায়; তারাই জাতির তরুণদের মুখপত্র—পথ-প্রদর্শক। চীনের লক্ষ কোটী

নিরক্ষর নরনারীকে বিনা পয়সায় শিক্ষাদেবার এই যে আন্দোলন ছাত্র-সমাজ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হ'ল, সুধী পণ্ডিতবর্গ তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন,—এযে স্বার্থহীন সদিচ্ছায় অনুপ্রানিত। বিরাট ভাবে প্রথম পরীক্ষা সুরুহ'ল Changsaর ; উদ্দেশ্য ছিল Changsa য় নিরক্ষর কেউ থাক্‌বেনা।

"দলে দলে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা পতাকা হাতে পথে বেরিয়ে পড়্‌লো—পতাকার বুকে লেখা—মুর্খলোক অন্ধের সমান, তোমার পুত্র কি অন্ধ ? মুর্খ জাতি দুর্ব্বল ; চীনের মুক্তি কিসে ? সাধারণের শিক্ষায়; তোমরা কি মনে স্থান দাও যে, চীনের শতকরা ৭৫ জন অন্ধ থাক্‌ ?

"দলে দলে তারা যথোচিত উপকরণ নিয়ে জেলায় সহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। তিন দিন ভ্রমণের পর তারা প্রায় ১৪০০ ছাত্র সংগ্রহ করলে। এদের মধ্যে ১২০০ পুরো নির্দ্দিষ্ট কাল শিক্ষালাভ করে পরীক্ষায় উপস্থিত হ'ল। তাদের মধ্যে ৯৬০ জন কৃতকার্য্য হয়ে সার্টিফিকেট্‌ পেয়েছে।"

Changsaর মত Chefooতেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো। প্রথম যেদিন বিরাট সভা হ'ল,—দোকান পাট সেদিন সব বন্ধ। তিনশরও অধিক ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার্থী সংগ্রহে ব্যাপৃত হল। ৬২ টা দল গড়ে এক একটি দল এক এক জেলায় চললো। দুদিনের মধ্যেই ছাত্ররা ১৫০০ বালক যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ শিক্ষার্থী সংগ্রহ করলে, ছাত্রীরা সংগ্রহ করলে ৭০০ বালিকা, যুবতী প্রৌঢ়া

ও বৃদ্ধা। অপূর্ব্ব উৎসবের মধ্যে তাদের হাতে-খড়ি হ'ল। এদের মধ্যে ৭বছরের শিশু থেকে ৬৭ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত ছিল। Chefooর এই আন্দোলনেরও উদ্দেশ্য ছিল "Chefooতে নিরক্ষর কেউ থাকবেনা"।

এমনি করে ছাত্র-সম্প্রদায়, যারা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সব কিছু জোর করে ডুবিয়ে দিয়ে আত্ম-প্রবঞ্চিত হতে বাধ্য, তারাও পুস্তকের পাতার বাইরে, বিদ্যালয়ের প্রাচীরের প্রান্তে, কর্ম্ম কেন্দ্রের সৃষ্টি করলে। নিজেদের উন্নত অবস্থার সঙ্গে নিরক্ষর অনুন্নত অসংখ্য দেশবাসীর তুলনা করে তার ভাব্‌লে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাদের পক্ষে অনধিকার, যতদিন না তারা ওই হতভাগ্যদের নিজেদের সমানকরে গড়ে তুলতে পারছে। সারা দেশে তরুণের মধ্যে এ আদর্শ সূর্য্যের আলোর মত ছড়িয়ে পড়্‌লো।

চীনে যেসব পাশ্চাত্য-জাতি স্বীর অন্যায় অধিকার অর্জ্জন করেছে, তারা সেই হীন-স্বার্থের সিন্দুকটাকে যক্ষের মত দিবারাত্র আগ্‌লিয়ে আছে, কোথাও কিছু আন্দোলনের আভাষ-মাত্রে সচকিত হয়ে ওঠে। এই বিরাট আন্দোলনে তাদের পক্ষে নির্ব্বাক থাকা অসম্ভব হ'ল,—চীৎকার করে তারা বলে উঠ্‌লো—এসব রুষিয়ার কাজ ; এতে কমিউনিস্‌ম্‌ এর গন্ধ আছে, ইত্যাদি।

এ অভিযোগ যে মিথ্যা, তা প্রমান হইয়া গেছে, চীনের নিষ্কলুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামে। নিজের অধিকার নিজে না দাবী

করলে, অপরের কতখানি ধৈর্য্য, শক্তি ও স্বার্থ আছে যে, সে অধিকার প্রতিপন্ন করাতে পারে? তার উপর স্বাভাবিকতাকে কৃত্রিম প্রমান করতে গেলে মস্তিস্ক-বিকৃতির পরিচয় দেওয়া হয় অথবা সত্যকে মিথ্যা করার কলঙ্ক মেনে নিতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিই :—নিশীথ-রাতে সুপ্ত-প্রতিবেশীর সাময়িক দুর্ব্বলতার অজুহাতে যদি তার কক্ষে প্রবেশ করে চুরিকরি এবং কপাল দোষে আর অনবধানে অপহরণ কালেই যদি প্রভাত হয়ে আসে আর সুপ্তোত্থিত প্রতিবেশী শয্যাত্যাগকরে জাগরণের আভাষ দেন এবং উপায়-বিহীন আমি যদি কম্পিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠি—সর্ব্বনাশ! ছার পোকা আর মশাতে ভদ্রলোককে জাগিয়ে দিলে—সর্ব্বনাশ! তাহলে উপরিউক্ত মন্তব্যটী আমাকে প্রয়োগ করা যায়নাকি—হয় আমি বিকৃত-মস্তিষ্ক নাহয় আমি মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করতেচাই—প্রতিবেশীর স্বাভাবিক জাগরণকে অস্বীকার করে মশা আর ছারপোকাকে দূষতে চাই। হীন-স্বার্থ রক্ষায়-যত্নবান পাশ্চাত্য জাতিদের অবস্থা ঠিক তদনুরূপ।

পূর্ব্বেই বলেছি ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা, ইটালী, ফ্রান্স এদের চীনে আধিপত্য করবার কোনও অধিকার নেই; সুতরাং এ অধিকার অসদুপায়ে তারা অর্জ্জন করেছে। এবং কারণনির্দ্দেশ করতে গেলে সাম্রাজ্যবাদের কথা ওঠে, আর এই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আসে ঔপনিবেশিক কলাকৌশল। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ধনী প্রভুদের অতি-উন্নত শিল্প-বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শিল্পের

অসম্ভব উন্নতির ফলে উৎপন্ন-দ্রব্যের পরিমান অসম্ভব বেড়ে গেল আর এই উদ্বৃত্ত দ্রব্য গলধঃকরণের জন্য উপনিবেশের আবশ্যক হ'ল। উপরন্তু এই সব উপনিবেশ অধীন থাকায় শিল্পোন্নত-পাশ্চাত্য-জাতির raw-materialর (কাঁচামাল) প্রয়োজনটা এই সব হত-ভাগ্য উপনিবেশের উপর দিয়েই হাসিল করে নিলে। সাম্রাজ্যবাদের বিষময় ফল ফল্‌লো। একজাতি দশ জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করলে। সভ্যতা, মানবজাতির মধ্যে শান্তি না এনে দূর-পনেয় অশান্তি সৃষ্টি করলে; অল্পসংখ্যক মানুষের উচ্ছৃঙ্খল-স্বাধীনতার আব্দার সহ্য করিতে গিয়ে বহু মানব স্বাধীনতা হারালে! পরাধীনের বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে বিশ্বের আকাশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

পাশ্চাত্য সভ্য-জাতীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তার সম্বন্ধে H.M. Hyndman বলেছেন, "বাণিজ্য-সভ্যতা বিস্তারের ফলে দেখা গেছে, অনেক স্থলে প্রাচীন সমাজ বিকল হয়েছে; আর কুলীমজুর শ্রেণীর লোকেরা সাময়িক অথবা চিরন্তন খাদ্যাভাবে ভুগে মরেচে।' উৎকৃষ্টতর রাজ-নৈতিক ক্ষমতা আর অর্থনৈতিক জয়দ্বারা পশ্চাত্যের এই সব সাম্রাজ্য-বাদীরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতিদের দাবিয়ে রেখেছে। আধিপত্য-মোহ পদানত-জাতির জীবিকাটুকুও নষ্ট করতে উৎসাহ দিয়েছে, যাতে পুরো জাতটাই পৃথিবীর বক্ষ হতে লুপ্ত হয়ে যায়। মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় পাঁচটা মহাদেশের মধ্যে সাড়ে তিনটার ত রংই বদলে গেছে। আর ঐ

পাঁচটা বিশাল জাতির মধ্যে সাড়ে তিনটী জাত হয় পরাধীন, নয় লুপ্ত হওয়ার দাখিল।

কিন্তু এত অত্যাচার চিরকাল কেউ নীরবে সহ্য করেনা; আর প্রাচ্যের উৎপীড়িত জাতিরাও তা করেনি। সবাই আজ সাম্রাজ্য বাদীদের বাধা দিতে চায়। H. M. Hyndman বলেছেন—

"এ কথা সত্য যে ইউরোপের জাতিদের মধ্যে বৈষম্য যতখানি তার চেয়ে অধিক পার্থক্য এসিয়ার পরস্পর জাতিদের মধ্যে বর্ত্তমান। কিন্তু এ কথা আরও সত্য যে এসিয়ার কৃষ্ণাঙ্গরা ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে।

চীনের বিপ্লব-আন্দোলনও সাম্রাজ্যবাদের মূলে আঘাত করতে সচেষ্ট। রুষিয়া এ যুদ্ধে চীনের বলবৃদ্ধি করলে—রুষিয়ার যুগান্তরকারী বিপ্লবের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। ১৯১৭ সালের আগেপর্য্যন্ত রুশিয়া জার সম্রাটের অধিনে ছিল। 'জার' বংশ পৃথিবীর স্বেচ্ছাচারী রাজ-বংশের মধ্যে অন্যতম। আবহমানকাল চীন 'জার'-পদানত-রুষিয়া কর্ত্তৃক শোষিত হয়েছে। ওদিকে উৎপীড়িত নর-নারী মুক্তির আদর্শ নিয়ে রুষিয়ার বিপ্লবানল জ্বলে উঠ্‌লো! ১৯১৭ সালে 'জার'-বংশ ধ্বংস করে সেখানে বিরাট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। নব্য-রাষিয়ার আদর্শ হচ্চে পৃথিবীতে উৎপীড়িত জাতি কেউ থাকবেনা; সবাই হ'বে স্বাধীন। এই মর্ম্মে তারা 'জার' কর্ত্তৃক উৎপীড়িত দেশসমূহকে মুক্তির চুক্তি লিখে দিয়ে তাদের সঙ্গে সহজ বন্ধুত্ব স্থাপন করলে। চীন রাশিয়াকে সুহৃদ-স্বরূপ পেলে।

স্বার্থান্বিত ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি জাতিরা এটুকুও সহ্য করতে পারলেন।। তাদের ভয় হ'ল',—সম্রাজ্য-বাদের উচ্ছেদ-সাধনই হচ্চে বোল্‌শেভিক্‌-রাশিয়ার মূলমন্ত্র ; চীনও যদি ওই মন্ত্র আওড়াতে শেখে ত' সর্ব্বনাশ ! তা'হলে নির্ব্বিবাদে অগোচরে জোঁকের মত বসে রক্ত-শোষণ আর সম্ভব হ'বেনা ; হয় কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি নিয়ে-রুখে দাঁড়াতে হ'বে ; না হয় সুড়্‌সুড়্‌ করে সরে' পড়্‌তে হ'বে ! তা'রা পাৎলা-জিব আর বিলাসী-ঠোঁটের সাহায্যে প্রচার কর্‌তে লাগ্‌লো,—"গত বিপ্লবের দরুণ রাশিয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত কমে গেছে। সে অবস্থায় চীনে আধিপত্য করা অসম্ভব দেখে, তারা বুদ্ধিমানের মত সরে পড়েছে।"

উপরি-উক্ত মন্তব্যটী শুধু হীনতারই পরিচয় দেয়না, নির্ব্বুদ্ধি-তারও পরিচয় দেয় বটে। প্রকৃতই, আজকালকার বোল্‌শেভিক্‌-রাশিয়ার ক্ষমতা অতীতের সম্রাটাধীন রাশিয়ার ক্ষমতার চেয়ে ঢের বেশী। আর যদি কমেই গিয়ে থাকে ত' সে হল্যাণ্ড্‌, স্পেন, পর্টুগাল্‌ প্রভৃতি দেশের অনুরূপ-অধীকারওত' চীনে দাবী কর্‌তে পার্‌তো ? কিন্তু তাও সে করেনি ; কারণ সে, ওই সব দলে ভিড়্‌তে অস্বীকার করেছে ; ওদের হীনতায় সে লজ্জিত। নিজে-দের হীন স্বার্থের সঙ্গে রাশিয়ার স্বার্থের সমন্বয় সম্ভব হ'ল'না বলেই—ওরা রাশিয়াকে ঈর্ষার চোখে দেখ্‌তে শুরু করে দিয়েছে ; আর চীনকে 'বোল্‌শেভিক্‌দের ভয় দেখাচ্ছে, সেই মূর্খের মত যে,

নিজে ভূতের ভয় পেয়ে অপরকে ভয় দেখায়—'ভূত তোর, ঘাড় মট্‌কাতে যাচ্ছে' !

চীন কা'রও কথায় আর ভয় পাবেনা। চীনের যুবজন বিপ্লব-গুরু—Sun Yatsen'র মন্ত্রনিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে—

"জনসাধারণকে জাগিয়েদাও। পৃথিবীর যে সব জাত আমাদের সমান ভাবে দেখে তাদের সঙ্গে একত্র হয়ে বিজয়-অভিযানে চলো।"

বিপ্লবী যারা, তারা পরিবর্ত্তন চায়। কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের অর্থে দয়াদাক্ষিণ্য কিছুর আভাষ নেই ; তারা নির্ম্মমভাবে বলে'—কোনও সংস্কারের দোহাই দিয়ে কিছু আগ্‌লে রাখ্‌লে চল্‌বেনা ; আমরা চাই পরিবর্ত্তন,—মূলহতে শীর্ষ পর্য্যন্ত। চীনের যুবজনও ছিল বিপ্লবী ; তারা রাজনৈতিক এবং সামাজিক ধারাকে একেবারে বদলে ফেল্‌তে চায় ; তারা চায় চীনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনা করতে ;—প্রাচীন চীনের ভস্মাবশেষের উপর নব্য-চীনকে অধিষ্ঠিত করতে।

আন্দোলনের ধাক্কাতেই হোক্, আর স্বাভাবিক ভাবেই হোক্—চীনের কুলীমজুররাও নিজেদের অভিযোগ ব্যক্ত করতে লাগ্‌লো। কল-কারখানার ধনীমালিকদের সঙ্গে-কলহ বাধলো মাইনে প্রভৃতি -নিয়ে। ক্রমশঃ, বিপ্লবী ছাত্রদের সুপরিচালনায় এই বিরাট উপেক্ষিত সম্প্রদায়ও ভীষণ বিপ্লবী হয়ে উঠ্‌লো ; তারাও প্রচলিত সামাজিকধারাকে ধ্বংস করতে উন্মুখ।

"Taingtao এবং Sanghai'র জাপানী কাপড়ের-কলের কারখানাতে কিছুদিন হতে ধর্ম্মঘট চলছে; কুলীরা চায় মাইনে বাড়াক্। ধর্ম্মঘটের ফলে জাপানী-মালিক একজন কুলীকে গুলি-করে মার্‌লে। এ হত্যার বিচার পর্য্যন্ত হলোনা। এই নৃশংস কাজের প্রতিবাদ করে' চীনের ছাত্রেরা ৩০শে মে তারিখে রাস্তায় রাস্তায় Parade করে' বেড়াতে লাগ্‌লো। Pamphlet আর 'হ্যাণ্ড্‌বিল্ ছাড়া তাদের আর দ্বিতীয় অস্ত্র ছিলনা।

"ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অধীনে যে পুলিশ ছিল তারা এই demonstrationই শুধু বন্ধ করলেনা,—এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট একদল ছাত্রকে গ্রেপ্তারও করলে। সারাছাত্রসমাজ কারাগারের রুদ্ধ-তোরণে ঘা মেরে' বল্‌লে—'আমাদের বন্ধুদের ছেড়ে' দাও। কর্ণপাত না-করে পুলিশ তাদের সরে' যেতে আজ্ঞা দিলে। তারা কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়্‌লোনা; ফলে উদ্ধত ইন্‌স্পেক্টর হুকুম দিলে—'গুলী চালাও। ছ'জন বালক সেখানেই প্রাণ দিলে, চল্লিশজন আহত হ'ল—"

পাশ্চাত্যজগতে অমনি প্রচার হয়ে গেল যে' এই দুর্ঘটনার মূলে বোল্‌শেভিক্ কারসাজী আছে। কিন্তু এরূপ প্রচার করে এবারে-ও তারা মারাত্মক ভুল করলে। প্রতীচী একথা উপলব্ধি করতে অক্ষম হ'লনা যে, চীনের যুবজন বিপ্লব-ঘোষনা করেছে স্বজাতীর ও বিজাতীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। উপরন্তু, রাশিয়ার বোল্‌শেভিক্ আন্দোলন স্থুরু হয়েছে চীনের যুব-আন্দোলনের অনেক পরে।

চীনের যৌবন অভিযান

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিপ্লব ছিল রাশিয়ার উদ্দেশ্য; কিন্তু চীনের উদ্দেশ্য হচ্চে অন্যরূপ,—একটা প্রাচীন সভ্যতার কাঠামোকে বিনষ্ট করে নব-সভ্যতার প্রবর্ত্তন করা; এ বিপ্লব হচ্চে সভ্যতা-মূলক। চীনের জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, বিদেশে আর চীনাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা চল্‌বেনা; জাতি-হিসাবে চীনা আর একঘরে নয়।

চীনের যৌবন অভিযানকে পর্য্যালোচনা করে দেখা গেল যে, এর লক্ষ্য হ'চ্চে সমাজ-বিপ্লব; এর পথ হ'চ্চে রাজনৈতিক ধোঁয়ায় অন্ধকার, অর্থনৈতিক ধুলায় সমাকীর্ণ আর সভ্যতামূলক কুয়াশায় ঢাকা। কত কল্পনাতীত বাধা বিঘ্ন এ'র পথে। মজ্জাগত কুসংস্কার, গুরুজনের নিষেধ, আর রাজশক্তির বজ্রদণ্ড এ অভিযানের জীবনকে দুরূহ করে তুলেছিল; কিন্তু তবুও তা' চলেছে। বিদেশী শক্তির শত্রুতাও এ'কে দুর্ব্বল করতে পারেনি। বিপ্লবের তাণ্ডবনৃত্য বাধাবিপত্তির বুকে অবহেলার আঘাত-ছড়িয়ে দিলে!

একটা ক্ষুদ্র ক্ষুব্ধ সংঘকে জীবনস্বরূপ অবলম্বন করে চীনের যৌবন অভিযানের বিরাট মহীরুহ জগতের মধ্যে মাথা উঁচু করে' দাড়াল; তা'র মূল, চীনের জনসাধারণের প্রত্যেকের অন্তর হ'তে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করেছে।

অভিযানের পথে প্রমান হ'য়ে গেছে যে, নব্য-চীনের নেতারা যুদ্ধপ্রিয়-নিরেট-রাজনীতিক নয়, তাদের মধ্যে শক্ত-সমালোচকেরও

আভাষ পাওয়া যায়; তাদেরই মধ্যে চীনের জনসাধারণের শক্তি নিহিত। সমরপ্রিয় রাজনীতিকরা তাদের সম্মান করতে সুরু করে দিয়েছে। প্রতীচীর শক্তিমান জাতিরা তাদের স্মরণ করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাচ্যের এক প্রাচীন-সভ্যতা যৌবনে পুনঃ-অধিষ্ঠিত হওয়ার পথে চলেছে; যৌবন-দেবতা তা'র ললাটে রাজটীকা পরাতে আস্‌ছে। দর্শন, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণাই বদলে গেছে; যা' কিছু রয়েছে এবং ভবিষ্যতে থাক্‌বে সে সবই নূতন—জীবন্ত।

মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ সেইখানে, যেখানে নিষ্ঠুর-বাস্তবের কাছে আঘাত পেয়ে, প্রতিমুহূর্ত্তের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে জীবনের আদর্শকে উদ্ধার করা হ'য়েছে। যাঁদের জীবন এইভাবে সার্থক হয়েছে তাঁরা আমাদের পূজ্য, যাঁদের জীবন সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে—তাঁরা আমাদের বিস্ময়ের-বস্তু—সম্মান-যোগ্য। চীন ভারতবর্ষের অতি নিকট; কিন্তু চীনের যুবজন আদর্শ-পূজারী হিসাবে আমাদের বহুউর্দ্ধে। সার্থক তাঁদের উক্তি,—

"ন্যায় ও স্বাধীনতার জন্য আমরা চীনে যুদ্ধ করছি, পরিপূর্ণ মুক্তজীবন আমাদের লক্ষ্য। আমাদের ভুল বুঝে, অযথা অপবাদ দিয়ে অনেকে আমাদের উপর অত্যাচার পর্য্যন্ত করেছেন, তবুও

আমাদের পায়ের চলা থামবে না। নব্য-চীন সংগঠনের পথে আমাদের মন্ত্র হ'বে—

পশুবল বিফল হ'বে মান্‌বোনা
সোনাকে মনের কোনেও আন্‌বোনা ;
উপাড়ি' বিত্ত-মূলে,
উপোষেয় ভাবনাভুলে
কাটাব ; ক্ষুধার কি ভয় জান্‌বোনা,
পশুবল বিফল হ'বে মান্‌বোনা ॥"

শেষ